সৈয়দ আলী আহসান ও বিশ্ব সংস্কৃতি

মাহমুদ শাহ কোরেশী

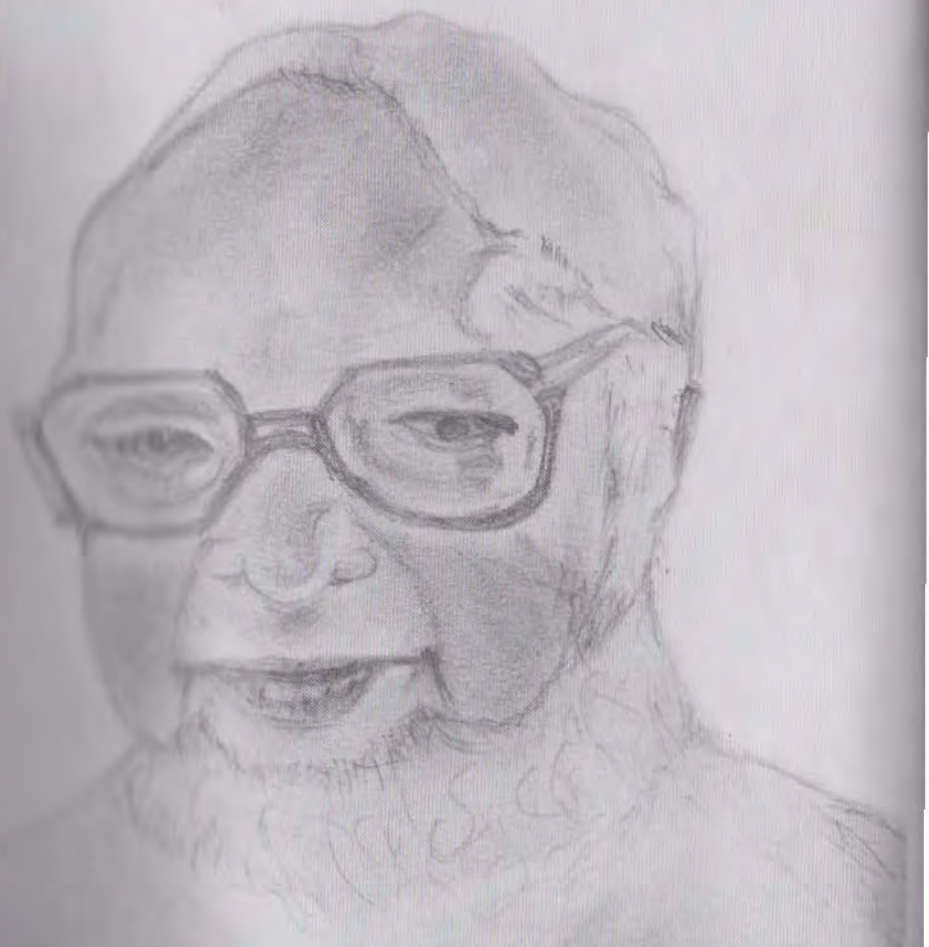

সৈয়দ আলী আহসান ও বিশ্ব সংস্কৃতি

মাহমুদ শাহ কোরেশী

এক বহুমাত্রিক প্রতিভার বিরল ব্যতিক্রমী ও বর্ণোজ্জ্বল উদাহরণ ছিলেন সৈয়দ আলী আহসান। বিস্ময়ের সীমা অতিক্রম করে গিয়েছিল তাঁর চিন্তন, লেখন ও বাচনশৈলী। মূলতঃ সাহিত্যের সঙ্গেই ছিল তাঁর হৃদয়ের আলাপন। তবে শিল্প, ইতিহাস, ধর্ম, দর্শন, ভাষা-বিজ্ঞান, সংস্কৃতি, সভ্যতা ইত্যাদি বিষয়ের সঙ্গে ছিল তাঁর নাড়ীর টান। নিবিড় সখ্য। ফলে সাহিত্য থেকে শিল্প, সমাজ থেকে ইতিহাস-সবকিছুর সঙ্গেই গড়ে উঠেছিল তাঁর নিপট নৈকট্য। সবকিছুর প্রতিই ছিল অন্তহীন অভিনিবেশ। ছিল মননের দীপ্তিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠা এক অপরূপ আত্মীয়তা। আবেগ ও মননের এক চমৎকার সংশ্লেষণ ছড়ানো আছে তাঁর সমস্ত লেখালেখিতেই। আছে পর্যবেক্ষণের তীক্ষ্ণতা। বিশ্লেষণের ব্যাপকতা এবং প্রকাশভঙ্গির অনন্যতা। বাংলাদেশের কোমল মাটিতেই তাঁর জন্ম ও বেড়ে ওঠা। কিন্তু বিশ্বনাগরিকের আয়ত দৃষ্টি ছিল তাঁর আজন্মকালের আরাধ্য। তাই তাঁর চিন্তা ও কর্মজগতে বারবার এসে কোলাকুলি করেছে ঘরের সঙ্গে বাহির। দেশের সঙ্গে বিদেশ। পাকিস্তান আমলের প্রথম দিকে যখন আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিচর্চার বৃত্তটি ছিল নিতান্তই সীমিত, তখন তিনি তাকে প্রসারিত করে দিয়েছেন আটলান্টিকের ওপার পর্যন্ত। আত্মীয়তা গড়েছেন ভারত, জাপান, জার্মান, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, ব্রাজিল, আমেরিকা, তুরস্ক, আরব, ইরাক, ইরানসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ভাষা, সাহিত্য-সংস্কৃতিচিন্তা ও দর্শনের সঙ্গে। আমাদের মনের বদ্ধ জানালার অর্গল খুলে সেখানে বইয়ে দিয়েছেন মুক্ত বাতায়নের অবাধ বাতাস। শব্দের শানিত আয়ুধের শিল্পিত ব্যবহারে অনিবার্য করে তুলেছেন মুক্তিযুদ্ধের বিজয়কে।

জীবন ও জগতকে তিনি কোন্ দৃষ্টিতে দেখেছেন, বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্কসূত্রকে কিভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, বাংলা ভাষা-সাহিত্যের বিশাল ভান্ডারকে কিভাবে মন্থন করেছেন, বিচার-বিশ্লেষণের নব আলোকে কিভাবে তাকে প্রভাময় করে তুলেছেন, বিশ্বসাহিত্যের বিশালতাকে কিভাবে ধারণ করেছেন আপন করপুটে–এই বইটিতে একের পর এক উন্মোচিত হয়েছে তারই বিস্ময় জাগানো রূপাবরণ।

প্রকাশক
সৈয়দা কমর জাবীন
সৈয়দ আলী আহসান স্মৃতি সংসদ
লেস্‌পোয়ার/আশায় বসতি
৬০/২ উত্তর ধানমন্ডি, কলাবাগান, ঢাকা-১২০৫
ফোন : ৯১২৮১৬০

একমাত্র পরিবেশক
আহমদ পাবলিশিং হাউজ
১৫২/২ জে গ্রীণ রোড, ঢাকা-১২০৫
ফোন : ৮১৫১৬৫১

প্রকাশকাল
ফেব্রুয়ারি, ২০১১/মাঘ, ১৪১৭

স্কেচ
সৈয়দা নাজ কমর

কভারের লেখা
মীর মুর্তজা আলী বাবু

কম্পোজ
মোহাঃ রাকিব হোসেন
কম্পিউটার অঙ্গন

মুদ্রণে
বর্ণমালা প্রিন্টার্স, আরামবাগ, ঢাকা-১০০০

মূল্য : ২০০.০০ টাকা

SYED ALI AHSAN & WORLD CULTURES
Dr. Mahmud Shah Qureshi

Published by
Syeda Quamer Jabeen
on behalf of
Syed Ali Ahsan Study Centre
60/2 North Dhanmondi, Kolabagan, Dhaka-1205.
Phone : 9128962

Price : Tk. 200.00 Only.
US $: 4 Euro : 3

ISBN : 984 11 0657 4

উৎসর্গ

বিগত তেত্রিশ বছরের বেশি সময়
আমার একান্ত কাছের মানুষ
সৈয়দ আলী আহসানের স্নেহধন্য সাহিত্য-সমালোচক
প্রফেসর ডক্টর সর্দার আবদুস সাত্তার
কল্যাণীয়েষু
মাহমুদ শাহ কোরেশী

ভূমিকা

আমাদের কালের অন্যতম সেরা সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সৈয়দ আলী আহসান। যাপিত জীবনে একজন বিশিষ্ট মানবতাবাদী ও সৃষ্টিশীল শক্তি হিসেবে বিগত পাঁচ দশকের বেশি সময় বাংলাদেশের আধুনিক কবিতা, সমালোচনা, সাহিত্য ও শিল্পতত্ত্ব বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন। বিদেশের বিচিত্র উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বসমূহের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব এদেশের সাহিত্য ও শিল্প জগতে এক নতুন চেতনালোক নির্মাণে সহায়ক হয়েছে। তাঁর বিবিধ গুণাবলীর সম্পূর্ণ পরিচিতি প্রদানে সক্ষম হবেন তাঁর গুণমুগ্ধ শিষ্য ও স্বজনরা। আবার অনেকটুকু পাওয়া যাবে এখনো অপ্রকাশিত পূর্ণাঙ্গ জীবনীগ্রন্থে। এখানে তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিগত জীবন-চর্যার কিছু আলেখ্য তুলে ধরবার প্রয়াস পেয়েছি তাঁর গ্রন্থপাঠের অভিজ্ঞতা থেকে অথবা ব্যক্তিগত পরিচয়ের সূত্রে।

স্বীয় প্রকাশ ক্ষমতার সীমাবদ্ধতার কথা স্মরণ রেখে প্রথমত আমি তাঁর সম্পর্কে কিছু লিখতে দ্বিধান্বিত ছিলাম। কিন্তু ১৯৮৫ সালে *সৈয়দ আলী আহসান সংবর্ধনা গ্রন্থ* সম্পাদনার ফলে বিচারপতি আবু সাইদ চৌধুরী, পরের বছর *অদ্রে মালরো : শতাব্দীর কিংবদন্তী* প্রকাশের ফলে রাষ্ট্রদূত সৈয়দ আব্দুস সুলতান ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন যে আমি যেন তাঁর সম্পর্কে লিখি। এক পর্যায়ে মনে হল স্বয়ং জাতীয় অধ্যাপকেরও সে অভিপ্রায়।

অবশেষে ২০০২ সালের ২৫শে জুলাই তাঁর আকস্মিক তিরোধানের পর ইনকিলাবের ফিচার এডিটর অধ্যাপক আব্দুল গফুরের অনুরোধে আমি লিখি "সম্পর্কের সূত্র ধরে" রচনাটি। ২০০৩-এর ২৬শে মার্চ মরহুম মনীষীর ৮৩তম জন্ম দিন উপলক্ষে তৈরি করি "সৈয়দ আলী আহসান ও বিশ্ব সংস্কৃতি" প্রবন্ধটি। এক সময় তাঁর

গ্রন্থাদি ও রচনাবলীর অনুপুঙ্খ পাঠ আমার অন্বিষ্ট হয়ে পড়ে। অবশ্য আমি কখনো ভাবিনি যে প্রতি বছরই তাঁর সম্বন্ধে দুটো করে যে নগন্য রচনা আমি লিখে যাচ্ছি তা একটি গ্রন্থে এভাবে প্রকাশ করবো। কিন্তু বয়সের ভারে এবং নানা কর্তব্যকর্মে লিপ্ত থাকার কারণে এখন নতুন গ্রন্থ রচনায় লিপ্ত হওয়া প্রায় অসম্ভব। অবশ্য আমি মনে করি, বিশ্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যগত বহুবিধ বিষয়ে সৈয়দ আলী আহসানের সম্পৃক্ততা নিয়ে আরো বহু গ্রন্থ রচিত হতে পারে। তাই আমার শ্রমের ফসল হয়তো সেসব রচনার কিছু উপাদানরূপে কাজে লাগবে।

গ্রন্থধৃত প্রবন্ধাবলি প্রকাশের ক্ষেত্রে অধ্যাপক আব্দুল গফুর ছাড়াও কবি আল মুজাহিদ ও সাহিত্য সম্পাদক জাকির আবু জাফরের ঐকান্তিক আগ্রহ আমাকে যুগপৎ মুগ্ধ ও বিব্রত করেছে। আমার স্ত্রী সৈয়দা কমর জাবীন ও তাঁর মামা খান মোহাম্মদ আমীর আমাকে প্রবল উৎসাহ যুগিয়েছেন। শেষ মুহূর্তে ন্যুইয়র্ক থেকে ঢাকা বেড়াতে এসে কবিকন্যা সৈয়দা নাজ কমর ওরফে জিনাত মাসুদ দ্রুত একটি স্কেচ এঁকে দিয়েছেন যা গ্রন্থের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে। ধন্যবাদ জানিয়ে এঁদের কারু ঋণ শোধ করা যাবে না।

মাহমুদ শাহ কোরেশী

৪ঠা ফেব্রুয়ারি, ২০১১

সুচি

সৈয়দ আলী আহসান ও বিশ্ব সংস্কৃতি	৯
ব্রিটিশ বুদ্ধিজীবীর বন্ধুত্ব	১৫
তাঁর ফরাশি সম্পর্ক	২৩
সুগভীর জাপান উপলব্ধি	২৮
জার্মান সংস্কৃতির সান্নিধ্য	৩৭
তুর্কি-আরবী ঐতিহ্যের নৈকট্য	৪৬
ইরান থেকে গ্রহণ	৫৫
ব্রাজিলের অভিজ্ঞতা	৫৯
আমেরিকা : অন্তরঙ্গ অবলোকন	৬৩
"এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে ..."	৬৮
রবীন্দ্রনাথ : তাঁর মন ও মননে	৭৫
নিবিষ্ট নজরুল নিরীক্ষা	৮৬
মুক্তিযুদ্ধের অনন্য কণ্ঠস্বর	৯৭
মরণোত্তরকালে প্রকাশিত তিনটি নতুন বই	১০৪
বাংলা নববর্ষ, তাঁর অনুভবে	১০৭

সংযোজন

সম্পর্কের সূত্র ধরে	১১০
প্রাথমিক প্রয়াস	১১৬
আবু রুশদের সঙ্গে সম্পর্ক ও অন্যান্য	১২৪
WILLIAM MEREDITH AND HIS BENGALI DOUBLE	১৩০
LEOPOLD SEDAR SENGHOR : A LETTER & A POEM	১৩৭

সৈয়দ আলী আহসান ও বিশ্ব সংস্কৃতি

প্রথমাবধি সৈয়দ আলী আহসান ছিলেন একজন সমাজ-সচেতন সংস্কৃতিকর্মী। তাঁর স্কুল জীবনের শেষ পর্যায়ের কাহিনী আমরা খুব ভাল জানি না। তবে বোঝা যায়, অখন্ড মনোযোগের সঙ্গে এ সময়ে তিনি ব্যাপক সাহিত্যপাঠ ও কাব্যানুশীলন করে চলেছেন। অনেকের কাছে অজানা আরো দুটি তথ্য এখানে পরিবেশন করা যায়। একটি হচ্ছে খুব অল্প বয়সেই জনসমক্ষে বক্তব্য উপস্থাপন তথা 'পাবলিক স্পিকিং'এ পারদর্শী হয়ে ওঠেন তিনি। শোনা যায়, ষষ্ঠ-সপ্তম শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে, ধামরাইতে তাঁকে কেউ কেউ কোলে-কাঁধে চড়িয়ে সভাস্থলে নিয়ে যেত। আরেকটি খবর হলো – কবি-সাহিত্যিকদের ক্ষেত্রে সাধারণত যা প্রকৃতি বিরুদ্ধ – তিনি ছিলেন অংকে অসম্ভব মেধাবী। বহু জটিল সমস্যা অংকের সূত্রে ফেলে মুখে মুখে তাঁকে সমাধান করতে দেখা যেত। স্কুল জীবনের শেষ পর্যায়ে তিনি এবং তাঁর বন্ধু মাহবুবুর রহমান খাঁ (অধ্যক্ষ আব্দুর রহমান খাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র, প্রখ্যাত স্থপতি এফ আর খাঁ'র বড় ভাই) যৌথভাবে *অভ্যুদয়* নামে হাতে লেখা সংকলন বের করেছিলেন। এ পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের প্রতি দুই বন্ধুর আগ্রহ ছিল অসামান্য।

ঢাকা কলেজে অধ্যয়নকালে (১৯৩৮-৪০) আমরা তাঁকে সাংস্কৃতিক নেতৃত্বদানের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণে তৎপর দেখি। এ সময়ে তিনি পত্রিকা প্রকাশ ও নাট্যাভিনয়ে ছাত্রদের মধ্যে উৎসাহ সৃষ্টির প্রয়াস চালান। অল্প পরে, ১৯৪২ সাল থেকে উপমহাদেশে মুসলিম স্বাতন্ত্র্য চেতনার যে ঝড়ো হাওয়া বইতে থাকে তার সূত্রপাত ঘটে কলকাতা ও ঢাকায় – পূর্বপাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি ও পূর্বপাকিস্তান সাহিত্য সংসদ প্রতিষ্ঠার ফলে। সাহিত্য সংসদের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক ছিলেন সৈয়দ আলী আহসান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের ছাত্র। ঢাকার উঠতি বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে আব্দুর রাজ্জাক (পরবর্তীকালে জাতীয় অধ্যাপক), সৈয়দ

সাজ্জাদ হোসায়েন, মাযহারুল হক (অর্থনীতিবিদ), সৈয়দ আলী আশরাফ, সরদার ফজলুল করিম, মুনীর চৌধুরী প্রমুখ অনেকেই কয়েক বছর ধরে এই প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছেন সোৎসাহে। ১৯৪৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে এমএ ডিগ্রী লাভের পর সৈয়দ আলী আহসানের কার্যক্ষেত্র হয়ে দাঁড়াল কলকাতা। অল্প সময় হুগলী কলেজে অধ্যাপনার পর তিনি চাকরি পেলেন সর্বভারতীয় বেতার প্রতিষ্ঠানে। কলকাতার বহু খ্যাতনামা সাহিত্যিক-শিল্পী ও পন্ডিতদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হলো। তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু মহল গঠিত হলো ফররুখ আহমদ, শওকত ওসমান, আহসান হাবীব, মতিউল ইসলাম, সিকান্দর আবু জাফর প্রমুখকে নিয়ে। কাব্যচর্চায় সক্রিয় থাকলেও এ সময় থেকে তিনি ইংরেজি ও ইউরোপীয় ক্লাসিক ও আধুনিক সাহিত্য, বিশ্বসভ্যতা, প্রত্নতত্ত্ব, হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের সারাৎসার সম্পর্কে জ্ঞান লাভে ছিলেন সচেষ্ট। এই অধ্যয়ন প্রবাহের ফলাফল প্রত্যক্ষ করা যাবে ষাটের দশকের শেষের দিক থেকে।

পঞ্চাশের দশকের মধ্যভাগ পর্যন্ত আদি ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অধ্যয়নে অনেকটা বাধ্য হলেন চাকরিগত কারণে। পরবর্তী অর্ধদশক করাচীতে বসে তিনি স্বাধীনভাবে বাংলা সাহিত্য অধ্যয়ন – আলাওল, ভারতচন্দ্র, মাইকেল, নজরুল বিষয়ক গবেষণায় আত্মনিয়োগ করলেন, হিন্দী-অবধী ভাষায় অধিকার অর্জনে সচেষ্ট হলেন। ১৯৫৬ সালে প্রথম বিলাত গমনের পর সমগ্র বিশ্বের বন্ধ দরজা যেন অকস্মাৎ খুলে গেল তাঁর সম্মুখে। তখন থেকে অধ্যাপক আহসান আর 'সংকীর্ণ পাকিস্তানী মনোভাবাপন্ন' না থেকে ইঙ্গ-মার্কিন, ফরাশি-জার্মান, হিস্পানী-পর্তুগীজ, ইটালীয়, মধ্যপ্রাচ্য, এমনকি জাপানী সংস্কৃতির প্রতিও ভীষণ অনুরাগী হয়ে পড়লেন। ইসলামকে, বাংলাদেশকে, দক্ষিণ এশিয়ার ঐতিহ্যকে, ইন্দো-ইরানীয় ভাষা সভ্যতাকে একান্ত আপনার ভেবে ভালোবাসলেও, বহির্বিশ্বের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সংস্কৃতিসমূহকে, বিশেষ করে ইংরেজি সাহিত্য, ফরাশি কবিতা – কথা-সাহিত্য, শিল্পকলা, ভাস্কর্য, সিনেমা, রান্না, জর্মন, দর্শন, বিদ্যাচর্চা ও নির্মাণ কৌশল, মার্কিন সাহিত্য ও তথাকার বহুধাব্যাপক গণতান্ত্রিক কর্মধারা গভীর অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন ও অনুধাবন করতে প্রয়াসী হলেন। এখন একটু পেছন ফিরে তাকালে মনে হয়, এমন ব্যাপক আয়োজন সমকালীন আর কোন বাঙালি সাহিত্যিক করতে চেয়েছেন কিংবা করতে পেরেছেন কিনা তাতে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। উল্লেখ্য যে, শতাধিক প্রকাশিত পুস্তক-পত্রিকা ছাড়াও তাঁর অপ্রকাশিত পান্ডুলিপির সংখ্যা

দু'ডজনের ওপরে। বস্তুত, পুস্তকপ্রীতি-বইকেনার প্রতি আগ্রহ এবং দ্রুত পঠনের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অনতিক্রম্য গ্রন্থামোদী।

১৯৫৬ সালের পর তিনি খুব ঘন ঘন বিদেশ যাবার সুযোগ পান। অন্তত দশবার চলেছে তাঁর বিশ্বভ্রমণ। লন্ডন-প্যারিস-ফ্রাংকফুর্ট তো ডালভাত, পর্তুগাল, ব্রাজিল, জাপান, ইরান, তুরস্ক, লেবানন, সিরিয়া, ইরাক, মিশর, সৌদি আরব, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন, হংকং, রাশিয়া প্রভৃতি দেশে তিনি গেছেন একাধিকবার। এসব ভ্রমণ সম্ভবপর হয়েছে প্রধানত পিইএন ও কংগ্রেস ফর কালচারেল ফ্রিডম এর অর্থানুকূল্যে। যদিও ষাটের দশকের মধ্যভাগ থেকে তিনি শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন, তবুও মৃত্যুর কিছু পূর্ব পর্যন্ত বিশ্বের সেরা বহু মনীষীর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ থাকে অব্যাহত। স্বাভাবিকভাবেই সম্পর্ক কারো সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ, দীর্ঘস্থায়ী, আবার কারো সঙ্গে স্বল্প সময়ের, এক-আধবার সামান্য দেখা বা আলাপ। কিন্তু লক্ষ্য করা গেছে যে, সৈয়দ আলী আহসান যাঁদের সঙ্গে একবার কিছু কথাবার্তা বলেছেন তাঁরা বহুদিন পরেও তাঁকে সুস্পষ্টভাবে স্মরণ রাখতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর কোন বক্তব্যকে উপলক্ষ করে পুনরায় সংলাপ নির্মাণে সচেষ্ট থেকেছেন। এখানে তাঁর সঙ্গে নানাভাবে সম্পর্কিত জানা-অজানা মনীষীবৃন্দের মোটামুটি একটি তালিকা উপস্থাপন করতে চাই। তালিকাটি আপাতদৃষ্টিতে দীর্ঘ মনে হবে। কিন্তু এতেও অসাবধানতাবশত বহু নাম বাদ পড়ে গেছে –

ভারত : ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, ইন্দিরা গান্ধী, অন্নদাশংকর রায়, লীলা রায়, বিকাশ রায়, ভানু বন্দোপাধ্যায়, যামিনী রায়, ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, ড. কালিদাস নাগ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুধীন দত্ত, রাজেশ্বরী দত্ত, হুমায়ুন কবীর, আবু সাইয়িদ আইয়ুব, জাস্টিস এসএ মাসুদ, প্রবোধ কুমার সেন, প্রবোধ কুমার সান্যাল, শিব নারায়ণ রায়, মৈত্রেয়ী দেবী, সুশীল ভদ্র, ড. নরেশ গুহ, ড. দেবীপদ ভট্টাচার্য, ড. সুরেশ মৈত্র, সচ্চিদানন্দ বাৎসায়ন, মূলকরাজ আনন্দ, জয় প্রকাশ নারায়ন, অশোক মেহতা, এবি শাহ, প্রভাকর পাধ্যায়, রচি হিংগুরাণী, সিদ্ধার্থ শংকর রায়, পদ্মজা নাইডু, মিনু মাসানী, উমাশংকর যোশী, ড. উমেশচন্দ্র পানিগ্রাহী, সুজাতা প্রিয়ংবদা, ড. ভূদেব চৌধুরী, ড. কল্যাণ কুমার দাশগুপ্ত, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, ড. অনিমেষ কান্তি পাল, ড. লোকনাথ ভট্টাচার্য, অম্লান দত্ত, খুশবন্ত সিং, দেবদুলাল

বন্দোপাধ্যায়, সাগরময় ঘোষ, প্রণবেশ সেন, শশধর রায়, পৃথীশ নন্দী, পৃথীন্দ্র মুখোপাধ্যায়, গৌরকিশোর ঘোষ প্রমুখ।

যুক্তরাজ্য : টিএস এলিয়ট, ইএম ফরস্টার, স্টিফান স্পেন্ডার, চার্লস ম্যাটান, ডিএইচ প্রিচিট, ম্যালকম ম্যাগারিজ, (স্যার) কম্পটন ম্যাকেঞ্জি, নোয়েল কাওয়ার্ড, (স্যার) হার্বার্ট রীড, (ড.) আনেস্ট কী, পিটার এলস্টপ, টেড হিউজ ও অন্যান্যরা।

ফ্রান্স : ক্লের গল, অঁদ্রে শঁসোঁ, জঁ দ্য বের, নিকোলাস নভোকভ, রজে কাইওয়া, রেমোঁ আরোঁ, অঁদ্রে গ্র্যাব্রতিয়ের, অঁদ্রে মাল্‌রো, শার্ল ভোদ্‌ভিল, ল্যুস ক্লোদ মেৎর, পিয়ের এমানুয়েল, রনে তাবেরনিয়ে, আন-মারি ওয়ালীউল্লাহ, ফ্রঁস ভট্টাচার্য ও কোঁ তাসু।

জর্মনী : রালফ ইটালিয়ান্ডার, আন-মারি শিমেল, গুন্টার গ্রাস প্রমুখ।

ইতালী : আলবের্তো মোরাভিয়া, ইগনাৎসিয়ো সিলোনে, এনজো তুরাবিয়ানি ও অন্যান্য।

ইন্দোনেশিয়া : মুকতার লুবিস ও ড. তকদির আলিস জাওয়ানা।

চেক : ড. হানা প্রেইনহ্যালটেরোভা, ভাকলাভ হ্যাভেল, ইভান জেলেনিক, ড. দুশান জ্‌ভাবিতেল ও ড. মিলোস্লাভ ক্রাসা প্রমুখ।

স্পেন : ড. সালভাদর মাদারিয়াগা।

হাঙ্গেরী : পল তাবোরি।

ঘানা : ড. কুফি বুসিয়া।

সেনেগাল : লেওপোল্‌দ সেদার সঁঘর, ড. আমাদু করিম গায়ে ও আহমদ মুখতার এমবো।

টোগো : মিঃ টোগো।

তিব্বত : লামা চিম্পা।

থাইল্যান্ড : সুলক শিবরক্ষা।

হংকং : ড. রাইড (ভাইস চ্যান্সেলর)।

ফিলিপাইন : ফ্রানসিস্‌কো সিয়োনিল হোজে, ওয়ান টুভেরা, নেক ওয়ালেক ও অন্যান্য।

জাপান : ইয়াসুনারী কাওয়াবাতা, ইচিয়ো ফুজোকাওয়া, তানিজাকি, জুন তাকামি প্রমুখ।

অস্ট্রেলিয়া : ম্যারিয়ান ম্যাডার্ন ও ফ্র্যাংক তোজী।

ইরান : জয়নুল আবেদীন রাহনুমা, ড. শাফাক ও সনতী প্রমুখ।

লেবানন : ড. নিকোলা জিয়াদে, ড. নবীহ আমিন ফারিস ও ড. কস্টি জোরায়েক।

ইরাক : ড. সালেহ আহমদ আল আজীর।

তুরস্ক : মাদাম হালিদা এদিব হানুম ও ড. সর্বোহি উলগেনা।

শ্রীলংকা : ড. শরৎচন্দ্র ও ফ্রাংকী।

কোরিয়া : সং কিজো।

কানাডা : ড. জোসেফ টি'ও কনেল ও জঁ মার্ক লেজে।

নেপাল : ড. মাধব গিরি ও মঞ্জুলা দেবী প্রমুখ।

পাকিস্তান : শাহেদ সোহরাওয়ার্দী, শায়েস্তা ইকরামুল্লাহ, আজিজ আহমেদ, ইবনে ইনশা, একে ব্রোহী, প্র. আহমদ আলী, কুররাতুল আইন হায়দার, জিএ আল্লানা, ড. এএইচ দানী প্রমুখ।

রাশিয়া : রেকটর চেলিয়াবিনস্ক স্টেট পেডাগজিক ইনস্টিটিউট, ড. সের্গেই সেরেব্রিয়ানী ড. দানিলচুক ও অন্যান্য।

আমেরিকা : আইভান ক্যাটস, জন হান্ট, এডওয়ার্ড শিলস, এডওয়ার্ড ডিমক, চার্লস ফার্গুসন, জন স্টেনবেক, জন ডস পাসোজ, এলমার রার্টস, হাওয়ার্ড ফাস্ট, বার্নার্ড মালামুড, মোহাম্মদ আলী (ক্যাসিয়াস ক্লে), ডোনাল্ড উীন, পল গ্রুনবোম, ডাটাস স্মিথ, ড. ক্লিন্ট সিলি, ড. ক্লারেন্স মালনী, হেনরি রাগো (সম্পাদক, দ্যা পোয়েট্রি), ড. হায়াকাওয়া, কাটরবার্ট ক্রিলি, ড. ইঙ্গলস, ড. হামিলটন গিভ, ড. ডেভিড কফ প্রমুখ।

উপর্যুক্ত তালিকাদৃষ্টে দেখা যাবে বহির্বিশ্বের বহু কবি, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, সম্পাদক, রাজনীতিজ্ঞ ও অন্যান্য প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের সঙ্গে সৈয়দ আলী আহসান ছয় দশকের বেশি সময় নানাবিধ সংলাপ নির্মাণে তৎপর ছিলেন যাতে উভয়পক্ষে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ সুনির্দিষ্ট হবার সুযোগ লাভ করেছে। মিসর, সৌদি আরব, ব্রাজিল প্রভৃতি আরো কয়েকটি দেশের শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের পুরো নামের তালিকা আমরা যোগ করতে

পারলাম না। পূর্বাহ্নে তাঁর পাঠস্পৃহার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এর ব্যাপক পরিচিতি তাঁর মৃত্যুর দু'বছর আগে প্রকাশিত গ্রন্থ *কথা বিচিত্র : বিশ্বসাহিত্য*। এতে সংকলিত ৬০টি প্রবন্ধের ভূমিকা স্বরূপ তিনি লিখেছেন :

> আমি আধুনিক সময়ে বাস করি এবং এ সময়কার বিশ্বসাহিত্য সম্পর্কে অনুসন্ধান করে থাকি। ... পড়ার বিষয়ের তো অন্ত নেই। আমি যে শুধু উপন্যাস পড়ি তা নয়, নাটক পড়ি, আত্মজীবনীমূলক লেখা পড়ি, ইতিহাস গ্রন্থ পড়ি এবং ধর্মীয় গ্রন্থও প্রচুর পড়ি। সকল ধর্মের গ্রন্থই পড়ি। তবুও অতৃপ্তি থাকে। মনে হয় অনেক কিছুই পড়া হলো না।
>
> কিন্তু সময় তো অফুরন্ত নয়। আমাকে আমার নিজস্ব সময়-সীমার মধ্যে বাস করতে হচ্ছে। তবু ইচ্ছার আনন্দ নিয়ে নতুন কোনো বই পেলে হাতে তুলে নেই। জীবন একজন মানুষকে যতটা সময় দেয় ততটা সময় যদি কেউ গ্রন্থপাঠে নিযুক্ত রাখতে পারে তাহলে সে তো অনেক পেল। তবে আমার আনন্দ এখানেই যে আমি যা পড়ি তা পাঠককে জানিয়ে থাকি, যেন পাঠক আমার আনন্দে আনন্দিত হতে পারে।

বস্তুত বহুকাল, বহু প্রজন্ম তাঁর সৃষ্ট জগৎ নিয়ে আনন্দিত থাকবে আর শিক্ষিত হবে – এতে সন্দেহের কোনো কারণ নেই। কেননা একই সঙ্গে আধুনিকতা ও ইসলামের সমস্ত স্বচ্ছতা, সৌন্দর্যবোধ ও সৃষ্টিশীলতা তুলে ধরতে ব্যয়িত হয়েছে তাঁর যাপিত জীবন যা নিঃসন্দেহে একটি প্রবহমান অনন্ত।

ব্রিটিশ বুদ্ধিজীবীর বন্ধুত্ব

লেখাটির নাম দেওয়া যেত বরং এ্যাংলো-স্যাকসন কিংবা ইঙ্গ-আইরিশ সংস্কৃতির মুখোমুখি বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপাদ থেকে আজ অবধি আমাদের ওপর এই মিশ্র সংস্কৃতির জগদ্দল পাথর বিশেষ চাপ সৃষ্টি করে চলেছে অনিবার। একদিকে যেমন ঘরকুনো অবস্থান থেকে তুলে এনে আন্তর্জাতিক বাজারের নিকটবর্তী করেছে, অন্যদিকে তেমনি আমাদের স্বাভাবিক সৃষ্টিশীলতাকে বাধাগ্রস্ত করেছে কিছু ভিন্নগামী পথ পরিক্রমায়। এতে বেশ কিছুটা অস্বাভাবিক হয়ে পড়েছে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির জগৎ। এসব অনুযোগ, অভিযোগ বহু বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির রয়েছে; বিষয়টি হয়তো বিতর্কিত এবং এখানে সে সম্পর্কে বিশদ আলোচনার অবকাশ নেই। আমরা এই সংস্কৃতির সন্ধান পাই ইংরেজি ভাষা শিক্ষার মাধ্যমে। ভাষার পর অবশ্যম্ভাবীরূপে আসে সাহিত্য। তারপর দর্শন, সমাজচিন্তা, রঙ্গরস ও আরো বহুকিছু।

সৈয়দ আলী আহসান (১৯২০-২০০২) যখন এই সংস্কৃতিতে অবগাহনের সুযোগ পেলেন তখন তার প্রভাব ছিল উত্তুঙ্গ; তবে প্রশাসনিক যে অবকাঠামোর মাধ্যমে এর পক্ষবিস্তার তার অবক্ষয়ও শুরু হয়ে গিয়েছিল ইতোমধ্যে। প্রাথমিক পাঠগ্রহণের দ্বিতীয় পর্বে তিনি ভর্তি হলেন আরমানীটোলা উচ্চ বিদ্যালয়ে। এটিকে আমরা যথার্থভাবে তাঁর ওপর প্রাগুক্ত-সংস্কৃতির প্রভাব গ্রহণের সময়রূপে চিহ্নিত করতে পারি। বেশ কম বয়স থেকে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়নে তিনি তৎপর হলেন। পরে তিনি লিখেছেন :

> আমি ভাবতাম, ঠিকমতো উচ্চারণ না করতে পারলে ইংরেজি ভাষার অর্থই সুস্পষ্ট হয় না। ইংরেজি উচ্চারণ বিষয়ে আমার নিজের একটি গর্ব ছিল। আমি আরমানীটোলা স্কুলের ছাত্র হিসেবে ডক্টর ওয়েষ্ট-এর কাছে ইংরেজি উচ্চারণ শিখেছি। কলেজেও

অল্পদিনের মধ্যে ডিবেট ও বক্তৃতায় সুনাম অর্জন করেছিলাম। (*জীবনের শিলান্যাস;* পৃঃ ৩৩)

সম্ভবত তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতা হচ্ছে "The Rose" নামে স্কুল ম্যাগাজিনে ছাপা একটি পদ্য।

সমকালীন পরিস্থিতি নিয়ে পরবর্তী সময়ে বিবৃত তাঁর একটি অভিজ্ঞতার কথা এখানে উদ্ধৃত করা যায় :

> আরমানীটোলা স্কুলের ইংরেজি শিক্ষক ড্যানিয়েল জোনসের সঙ্গে একদিন বিকেলে দেখা হয়েছিল ব্রিটানিয়া সিনেমার কাছে। ভদ্রলোক বয়সে তরুণ আমরাও তখন সবেমাত্র কলেজে প্রবেশ করেছি। সুতরাং তিনি আমাদের সঙ্গে বন্ধুভাবে কথা বললেন। যুদ্ধের কথাও হল। আমি হিটলারের দম্ভ এবং শক্তিমত্তার কথা বললাম। তখন ড্যানিয়েল জোনস বললেন, এসময় ইংল্যান্ডে যদি লয়েড জর্জ প্রধানমন্ত্রী থাকতেন তাহলে হিটলারের মোকাবেলা করতে পারতেন। তবে আর একজন লোক আছেন, যিনি হিটলারের মুখোমুখি দাঁড়াতে পারেন। তিনি হলেন চার্চিল। দেখবে কিছুদিনের মধ্যেই চার্চিল ক্ষমতায় আসবে। তখন যুদ্ধের চেহারা পাল্টে যাবে। ড্যানিয়েল জোনস ধীর শান্ত প্রকৃতির যুবা পুরুষ ছিলেন। অপূর্ব মধুর উচ্চারণে ইংরেজি কবিতা পাঠ করতেন। বর্তমানে জীবিত আছেন শুনেছি। ইংল্যান্ডের দক্ষিণে সালেক্স অঞ্চলে নিজের খামারবাড়িতে শেষ জীবন কাটাচ্ছেন। (ঐ; পৃঃ ২০)।

কলেজে তিনি শিক্ষকরূপে বাংলায় যেমন কাজী আব্দুল ওদুদকে পেয়েছিলেন তেমনি ইংরেজিতেও পেয়েছিলেন পরিমল কুমার ঘোষকে। ইংরেজি কবিতা মাধুর্যময় করে ব্যাখ্যা করতেন তিনি। ইংরেজ কবি শেলী ও কীটস তাঁকে হৃদয়ের নিভৃতলোক সুচিহ্নিত করতে সহায় হোন।

মূলত বিজ্ঞানের ছাত্র হলেও ইংরেজি কাব্য-পাঠের প্রেক্ষাপট স্কুলে থাকতেই প্রস্তুত হয়েছিল। ব্যাপারটি বিশ্লেষণ করে তিনি লিখেছিলেন :

> আমার চিন্তা এবং আবেগের পটভূমি নির্মাণ করেছিল শেলী এবং কীটস। এদের বিশ্বাস এবং অন্তর্জ্বালা আমি অনুভব করতে চাইতাম। তাই আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি অনার্স পড়বো এই সিদ্ধান্ত নিলাম। (ঐ; পৃঃ ৬৬)

পরবর্তীতে তাঁর আদর্শ বুদ্ধিজীবী-সুধীবৃন্দের শিক্ষার অনুশাসনলব্ধ একটি প্রশান্ত শৃঙ্খলা তাঁকেও আবরিত রেখেছিল। (ঐ; পৃঃ ৬৯)

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র জীবনে তাঁর ভাষা কিছুটা আবেগবহুল এবং তৎসম শব্দে আকীর্ণ হয়ে পড়ে (ঐ; পৃঃ ৮৮)। পরে ক্রমশ ইংরেজি ভাষাশৈলীর অনুশাসনে যুক্তিবাদী হন এবং শব্দের প্রয়োগবিধিতে নিজস্ব একটি ভঙ্গি নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন (ঐ; পৃঃ ৮৯)।

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় তিনি পার্ল বাক, টি এস এলিয়ট, ইয়েটস, সিনজ, লেডী গ্রোরি প্রমুখ মার্কিন ও আইরিশ লেখকদের লেখা ও চিন্তাধারার প্রতি প্রবলভাবে আকৃষ্ট হন।

এরপর কলকাতায় অলইন্ডিয়া রেডিওতে কর্মরত থাকাকালীন দু'জন প্রখ্যাত ইংরেজ সাহিত্যিকের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে। এঁদের একজন হলেন ই এম ফরস্টার অন্যজন নোয়েল কাওয়ার্ড। ১৯৪৬ সালে ফরস্টার একবার কলকাতায় এসেছিলেন এবং *Twilight in Delhi*-র লেখক প্রফেসর আহমদ আলীর বাড়িতে ছিলেন। ইতোমধ্যে ফরস্টার *A Passage to India*-র লেখকরূপে বিশ্বখ্যাত। সেবার বন্ধুজন জয়নুল আবেদিনের (শিল্পী নন) প্রয়োজনীয় ফরস্টার-এর একটি সাক্ষাৎকার উপলক্ষে ছিল সেই সাক্ষাৎ। তখন তাঁকে মনে হয়েছে বিনয়ী, সম্ভ্রান্ত, রুচিবান এবং বিজ্ঞ (*কথাচিত্র : বিশ্বসাহিত্য;* পৃঃ ১৬৪)। দ্বিতীয়বার দেখা হয় এক দশক পর করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ের রীডার এবং বাংলা বিভাগ প্রধান সৈয়দ আলী আহসান যখন প্রথমবার ইউরোপ সফরে গেলেন প্রথমতঃ লন্ডনে পিইএন-এর আন্তর্জাতিক লেখক সম্মেলনে, তখন। একটি সেশনে ফরস্টার ছিলেন সভাপতি। তাঁর ভাষণে, 'কবিতা কি করে কখন আবিস্কৃত হয়' তা যে বলা কঠিন এবং বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রজ্ঞায় এবং অনুভূতিতে কবিতার প্রকাশ ঘটে। এভাবে প্রতিটি প্রকাশের একটি নিজস্ব স্বভাব এবং তাৎপর্য আছে বলে জানান। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে একটি বিশ্বজনীন অভিব্যক্তি মূর্ত হয়ে ওঠে কবি ও নবীন অধ্যাপকের কাছে। পরে আলোচনার সূত্রে তিনি জনাব আহসানকে ক্যামব্রিজের কিংস কলেজে নিমন্ত্রণ জানান। সেখানে গিয়ে দুটি বিষয় তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 'প্রথমত কলেজের মাঠ।

> সবচেয়ে অনবদ্য হচ্ছে, কিংস কলেজের মাঠের ঘাসের আস্ত রণ। এত আশ্চর্য সবুজ, এত অনিবার্য সবুজ, এত বিপুল তরঙ্গের

মতো সবুজ আমি আর কোথাও দেখিনি। সকাল বেলার সূর্যের আলোয় এই সবুজগুলো মমতার আশ্রয়ের মতো মনে হয়। আমরা প্রতিদিনের ব্যবহারের উপকরণ থেকে উপমা সংগ্রহ করি তাই হয়তো ঘাসকে ভেলভেটের গালিচার সঙ্গে তুলনা করি। কিন্তু সেদিন আমার মনে হয়েছিল এ সমস্ত দিয়ে কোনো বিষয়কে ব্যাখ্যা করা যায় না। লনের ঘাসগুলো পরিশুদ্ধ এবং আনন্দময় ছিল। (*প্রেম যেখানে সর্বস্ব*; পৃঃ ৯৮)।

তাছাড়া ফরস্টার-এর অনবদ্য বাচনভঙ্গি এবং তাঁর রচনার একটি বিশিষ্ট স্বাদু বুদ্ধিমত্তা এবং দক্ষতা অনুভব করা যায়। সর্বোপরি তাঁর একটি ইনটিগ্রিটি বা সততা ছিল। (ঐ; পৃঃ ৯৯)

ফরস্টারের ডেরায় যে সাহিত্যিক আড্ডা বসেছিল তাতে সৈয়দ সাহেবের অভিজ্ঞতা থেকে দুটি দিক চিহ্নিত হয়ে গেছে। প্রথমত, তিনি তাঁর পুস্তক সংগ্রহের বর্ণনা দিয়েছেন যা এখানে পরিবেশন করা যায়।

> যে ঘরে আমরা বসেছিলাম সে ঘরে সর্বত্র বই, দেয়াল আলমারিগুলো ছাদ পর্যন্ত ছুঁয়েছে টেবিলে, কার্পেটে সর্বত্রই বই। একটি গ্রন্থরাজির অরণ্য যেন। আমি প্রশংসার দৃষ্টিতে চতুর্দিকে তাকিয়ে কি একটি মন্তব্য করেছিলাম। ফরস্টার উত্তরে বলেছিলেন, "এই বইগুলো আমার আবেগ এবং চিন্তা দ্বারা আচ্ছাদিত "Clothed with my passion and thought"। তিনি আরও বলেছিলেন, "এরা আমার লাভজনক সঙ্গী Profitable companions; পিছনের দিকে তাকিয়ে আমার কোন দুঃখ নেই। আমার আনন্দই অত্যাধিক, কেননা আমি গ্রন্থপাঠে অনেক কিছু জেনেছি যা জীবনের জন্য প্রয়োজন, যা নিশ্চয়তা দেয় এবং যা অসাধারণ। এ কারণেই আমি মনে করি, আমি মৃত্যুতে নিঃশেষ হবো না।" কথাগুলো কিন্তু বলেছিলেন তিনি অত্যন্ত স্পষ্ট বিশ্বাসে।

অধ্যাপক আহসান লক্ষ্য করেছেন যে, 'খুব বেশি বই না লিখলেও তাঁর সমকালের লেখকরা তাঁর প্রতি অসম্ভব শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। এর কারণ সম্ভবত তাঁর জ্ঞানের গভীরতা, মমতা এবং অর্ন্তদৃষ্টি। পৃথিবীতে মানবজীবন পাপ এবং পুণ্যের মধ্যে একটি বিপুল সংঘর্ষ আছে। এই সংঘর্ষটি তাঁর উপন্যাসের উপজীব্য। *Howard's End* উপন্যাসের মধ্যে পাপ এবং

পুণ্যের মধ্যে বিরোধটি অসম্ভব দক্ষতার সঙ্গে প্রকাশ করা হয়েছে। শুধু বিরোধটাই তিনি উপজীব্য করেননি, বিরোধের ফলে যে যন্ত্রণা সৃষ্টি হয়েছে সে যন্ত্রণার রূপকার তিনি ছিলেন। তাঁর মতো মহিমাময় পুরুষ পৃথিবীতে খুব বিরল' (*প্রেম যেখানে সর্বস্ব*; পৃঃ ১০১)।

ব্রিটিশ নাট্যকার নোয়েল কাওয়ার্ডের উপর সৈয়দ আলী আহসানের তিনটি লেখা পাওয়া যায়। প্রথমটি রয়েছে *প্রেম যেখানে সর্বস্ব* গ্রন্থে (পৃঃ ১১৪-১১৮), দ্বিতীয়টি *কথা বিচিত্র : বিশ্ব সাহিত্য* বইতে (নোয়েল কাওয়ার্ডের সান্নিধ্যে (২০০১; পৃঃ ১৬৩-১৬৬) এবং তৃতীয়টি *জীবনের শিলান্যাসে* (২০০২; পৃঃ ১২৭-১২৮) নোয়েল কাওয়ার্ড। দুটি রচনায় তিনি নোয়েল কাওয়ার্ডের সে সময়ে প্রকাশিত ডায়েরি পাঠের ফলে তাঁর সম্পর্কে যে ধারণা জন্মেছিল তা ব্যক্ত করেছেন; তাঁর প্রকাশিত ডায়েরিতে তাঁর অহমিকা, ঐশ্বর্য এবং সমৃদ্ধির প্রতি আকাঙ্ক্ষা, দুর্বলতা এবং অন্যের প্রতি অবহেলার চিত্র বহন করছে। (*কথা চিত্র*; পৃঃ ১৬৩)। অধ্যাপক আহসান কাওয়ার্ডের বৈশিষ্ট্যমন্ডিত ব্যক্তিত্বের একটি কৌতুকপূর্ণ এবং বহু বছর আগে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের মজার বিবরণ পরিবেশন করেছেন। তার দৃষ্টিতে, 'নোয়েল কাওয়ার্ড ছিলেন পৃথিবীর বুকে এক উদ্দাম পরিব্রাজক। যেহেতু পৃথিবীতে মানুষের সময়কালটা খুব সংকীর্ণ তাই এ সময়কে তিনি পূর্ণভাবে উপভোগ করতে চেয়েছিলেন। সম্প্রতি প্রকাশিত ডায়েরিতে এই পূর্ণকাম জীবনযাপনের পরিচয় পাওয়া যায়। ব্যক্তিগত জীবনে সমৃদ্ধির শিখরে উঠেছিলেন, অল্প সময়ের মধ্যে ইংল্যান্ডের নাট্যমঞ্চকে সজীব এবং প্রাণবন্ত করেছিলেন। মানুষের জীবনের বিকার এবং দুর্বলতাকে স্পর্শ করে যে রহস্য এবং কৌতুকের সংলাপ তিনি রচনা করে গিয়েছেন তা সত্যি অতুলনীয় (*প্রেম যেখানে সর্বস্ব*; পৃঃ ১১৭-১১৮)। তাঁর বিখ্যাত কমেডিগুলোর মধ্যে হে ফিভার *(Hay Fever)*, এবং *ব্লাইথ স্পিরিট (Blithe spirit)* অন্যতম।

কাওয়ার্ডের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে গিয়ে তিনি তাঁকে সমারসেট মমের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কেননা দু'জনেই 'প্রহসন রচনায় খ্যাতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিলেন'। সমারসেট মম অনেক ব্যঙ্গ-রসাত্মক নাটক লিখেছিলেন। তার মধ্যে *The Cycle* বা বৃত্ত খুবই বিখ্যাত। নোয়েল কাওয়ার্ড সমারসেট মমের চেয়ে অনেক বেশি তীক্ষ্ণ এবং চতুর। তিনি নাগরিক এবং সুরসিক এবং সহনীয় বিদ্রুপবাণে মানুষকে বিপর্যস্ত করতে

পারতেন। তাঁর দুটি প্রহসন খুবই খ্যাতি পেয়েছিল একটির নাম *Private Lives*, অন্যটির নাম *Post Mortem*। এ দুটো নাটকের মধ্যে দিয়ে তিনি বিংশ শতাব্দীর মোহভঙ্গের দৃশ্যপট উন্মোচন করেছেন। (*প্রেম যেখানে সর্বস্ব;* পৃঃ ১১৫)

১৯৪৫ কি ১৯৪৬ সালে নোয়েল কাওয়ার্ডের সঙ্গে কলকাতায় এক সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকারের সুযোগ পেয়েছিলেন তৎকালীন অল ইন্ডিয়া রেডিও'র কর্মকর্তা সৈয়দ আলী আহসান। আসলে তিনি সহকর্মী জয়নুল আবেদীনকে সঙ্গ দিচ্ছিলেন। আবার নির্মলা দে নাম্নী ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের একজন স্বাধীন দীপ্তিময়ী রমণীও তাঁদের সঙ্গ দিচ্ছিলেন। হোটেল কক্ষের সামনে উপস্থিত হয়ে তাঁরা যেন 'বিভীষিকা' দেখলেন :

> তীক্ষ্ণ নাসা দীর্ঘদেহী নোয়েল কাওয়ার্ড সম্পূর্ণ উলঙ্গ দাঁড়িয়ে আছেন। শরীর সুকঠিন, বাহু দুটি দীর্ঘ, ঝকঝকে উন্নত ললাট। ভদ্রলোক কোনরকম বিব্রতভাব দেখালেন না। একজন মহিলা আছে তাতেও না। তিনি নিশ্চিন্তে আমাদের ঘরের ভেতর আহ্বান করলেন এবং চেয়ারের উপর থেকে ডেসিং গাউন নিয়ে গায়ে জড়াতে জড়াতে বললেন, "তোমাদের দেশ বড় পাষন্ড দেশ, এতো গরম যে বলবার নয়। গায়ে জামা একেবারেই রাখা যায় না।" (*প্রেম যেখানে সর্বস্ব;* পৃঃ ১১৭)।

সে সময়ে কলকাতায় কাওয়ার্ডের কোনো বইয়ের চলচ্চিত্ররূপ প্রদর্শিত হচ্ছিল। লন্ডনের শহরতলীর কোনো রেলওয়ে স্টেশনের একটি রেস্তোরাঁকে কেন্দ্র করে বইটির সব ঘটনা আবর্তিত।
(*জীবনের শিলান্যাস;* পৃঃ ১২৭-১২৮)।

পরবর্তীকালে অধ্যাপক আহসান লিখেছেন, "আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি নোয়েল কাওয়ার্ডকে না জানলে আধুনিক ইউরোপীয়, বিশেষ করে ইংল্যান্ডের সমাজজীবনকে জানা যায় না।" (*কথা বিচিত্র;* পৃঃ ১৬৪)।

পঞ্চাশ বছর আগে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে ব্রিটিশ লেখক কম্পটন মেকেঞ্জীর। পিইএন কনফারেন্সে সে বছর অনেক উল্লেখযোগ্য লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল, যেমন টিএস এলিয়ট, চার্লস মর্গান, ই এম ফরস্টার প্রমুখ। আরও অনেকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, এদের মধ্যে কম্পটন মেকেঞ্জীকে তাঁর খুব সজীব এবং সতেজ মনে হয়েছিল। টিএস এলিয়ট

একটি সম্মানিত দূরত্বে থাকতেন। কিন্তু মেকেঞ্জী একটি হাস্যোজ্জ্বল প্রভায় আশেপাশের সকলকে উদ্ভাসিত করতেন। (*জীবনের শিলান্যাস;* পৃঃ ১৯৫)। তাঁর বর্ণনায় মেকেঞ্জীর শ্মশ্রুমন্ডিত গোলাকার চেহারা, প্রশস্ত ললাট, এমনিতেই লালচে মুখ কিন্তু নাসা খুব বেশি লম্বা। চোখ তীক্ষ্ণ কিন্তু কৌতুক মিশ্রিত। কথা প্রসঙ্গে স্যাভয় হোটেলে *ক্যান্টারবারী টেলস* সত্যি লেখা হয়েছে কিনা জিজ্ঞেস করলে তিনি জবাব দেন,

> ইংল্যান্ডের লোকেরা সবকিছুতেই ইতিহাসের সাক্ষ্য খোঁজে। পুরনো কথা কে লিখে রেখেছে, বলো? কিন্তু পুরনো কথা তো বানানো যায়, তাই না?

মেকেঞ্জী সত্তরটির বেশি বই লিখেছেন বলে জানা যায়। ১৯১৩ সালে প্রকাশিত তাঁর *সিনিস্টার স্ট্রীট* বইটি জোগাড় করে অধ্যাপক আহসান মনোযোগ সহকারে পাঠ করেছেন। দীর্ঘ পরিসরে প্রায় সাড়ে আটশ পৃষ্ঠার উপন্যাসের নায়কের জীবনের কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পণকালে যে আবেগের সংকট, ধর্ম এবং যৌনতার পারস্পরিক দ্বন্দ্ব তাতে তাঁর অনবদ্য রেখাচিত্র রয়েছে।

১৯৫৮ সালে লন্ডনে অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান ভিএস প্রিচিটের সঙ্গে পরিচিত হন। তিনি অভিজাত সাহিত্যপত্র *এনকাউন্টার*-এর সম্পাদক স্টেফান স্পেন্ডারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন। সেখানে প্রিচিটের সঙ্গে দেখা। তখন তাঁর সম্পর্কে তিনি কিছুই জানেন না। পরের বছর স্পেন্ডারের সঙ্গে প্রিচিট করাচী এলেন। সেখানে অবস্থানের কর্মসূচী প্রণয়নের দায়িত্ব ছিল অধ্যাপক আহসানের। এক পর্যায়ে তিনি এই বিখ্যাত ব্রিটিশ বুদ্ধিজীবীদ্বয়কে তাঁর বাসায় নৈশভোজে আপ্যায়নের সুযোগ পান। প্রিচিট তাঁকে নিজের লেখা *It May Never Happen* বইটি উপহার দেন। তাঁর কাছে প্রিচিট 'অত্যন্ত বাকপটু এবং বিভিন্ন জ্ঞানে পারদর্শীরূপে বিবেচিত। তবে লক্ষ্য করেছেন যে, প্রিচিটের গল্পে নর-নারী মিলনের আকাঙ্ক্ষা প্রাধান্য পেয়েছে, কিন্তু মার্জিত রুচি বিসর্জন দিয়ে নয়। তাঁর মতে, 'প্রিচিটের সকল লেখায় যৌবনের শক্তি, আনন্দ এবং উদ্দীপনার সংবর্ধনা আছে।' (*প্রেম যেখানে সর্বস্ব;* পৃঃ ১১১)। লন্ডনে ফিরে গিয়ে প্রিচিট *New Statesman and Nation* পত্রিকায় রসিকতা করে লিখেছিলেন

যে, অধ্যাপক আহসানের দাঁড়ি তাঁর কাছে 'পারসোনাল পোয়েম' হিসেবে চিহ্নিত।

প্রিচিটের কয়েকটি বইকে তিনি আধুনিক ইংরেজি সাহিত্যের সম্পদরূপে গণ্য করেন : *Dead Man Leading, Nothing Like Leather, You Make Your Own Life, In My Good Books*। তাছাড়া, প্রিচিটের দুটি গল্প "The Sailor" এবং "The Voice" নিয়েও তিনি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন।

কবি স্টেফান স্পেন্ডারের সঙ্গে সৈয়দ সাহেবের কয়েকবার সাক্ষাৎ হয়েছে, তাঁর বক্তৃতা শুনেছেন, তিনিও তাঁকে বই উপহার দিয়েছেন; কিন্তু তাঁর সম্পর্কে বা সাক্ষাৎ ঘটেছে এমন বিলাতের আরও ক'জন বুদ্ধিজীবী সম্পর্কে বিশেষ কিছু লেখেননি বা মূল্যবান কোন মন্তব্যও করেননি। তবে উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান হবে যে, তিনি ঈষৎ বিস্তৃতভাবে যে চারজনের প্রসঙ্গে লিখেছেন তা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ এবং উপভোগ্য। এছাড়া অনেকটা একাডেমিক আলোচনা রয়েছে নাট্যকার স্যামুয়েল বেকেট, নাদিন গরদিমার, ডেবেক ওয়ালকট, সীমুসহীনি, জেমস জয়েস, হাওয়ার্ড ফাস্ট, টেড হিউজ প্রমুখ ইংরেজি ভাষার লেখকদের ওপর। শেষোক্ত দু'জনের সঙ্গে ব্যক্তিগত দেখা-সাক্ষাতের বিবরণও পাওয়া যাবে তাঁর *কথা বিচিত্র : বিশ্বসাহিত্য* গ্রন্থে। সব মিলিয়ে ইঙ্গ-বঙ্গ সংস্কৃতির বিশ শতকী মিশ্রণের বিচিত্র পরিচয় বিধৃত রয়েছে সৈয়দ আলী আহসানের রচনায় ও জীবনাচরণে।

তাঁর ফরাশি সম্পর্ক

সৈয়দ আলী আহসান প্রথম বিলাত গমন করেন ১৯৫৬ সালে। লন্ডনে পিইএন-এর সভায়, এক আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলনে তিনি যোগ দেন। সে সময়ে তিনি ছিলেন করাচীতে কর্মরত। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তাঁর পাশে বসেছিলেন দার্শনিক-সাহিত্যিক হুমায়ুন কবীর। দেশ-বিদেশের বহু মনীষী ব্যক্তির মধ্যে ব্রিটিশ লেখক ই. এম. ফরস্টার, স্টেফান স্পেন্ডার প্রমুখ ছাড়াও ফরাশি ক'জন কবি ও বিদগ্ধ মনীষীর সঙ্গে তাঁর খুব হৃদ্যতা জমে যায়। সে সময়কার ও পরবর্তীকালের পরিচিত দশজন ব্যক্তিত্বের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে এখানে : ক্লের গল, অঁদ্রে শঁসোঁ, জ্যঁ দ্য বের পিয়ের এমানুয়েল, রনে তাবেরনিয়ে, রজে কাইওয়া, ভ্লাদিমির নবোকভ, ল্যুস ক্লোদ মেৎর, শার্ল ভোদ্‌বিল্ ও অঁদ্রে গ্যাব্রতিয়ের। এদের সবারই ফরাশি বুদ্ধিজীবী মহলে বিশেষ পরিচিতি আছে। কেউ কেউ বহির্বিশ্বেও সুখ্যাত।

কবি ক্লের গল (Claire Goll) হলেন স্বনামধন্য ফরাশি লেখক ইভঁ গল-এর পত্নী। শিল্পী পিকাসো, মার্ক শাগাল, সালভাদর দালি প্রমুখ এই দম্পতির ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ১৯৫৯ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর তিনি অধ্যাপক আলী আহসানকে তাঁর *আন্-আমুর ও কার্তিয়ে লাত্যাঁ* শীর্ষক উপন্যাসটি উপহার দেন। বইটি প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক-বুদ্ধিজীবী অঁদ্রে মাল্‌রো কে বিশ্বস্ত বন্ধুত্বের সূত্র ধরে' উৎসর্গীকৃত। ক্লের-এর সঙ্গে অধ্যাপকের প্রথম পরিচয় ক্যাম্ব্রিজে। ক্লের কিংস কলেজের লনে বসে রোদ পোহাচ্ছিলেন। দু'জনেই ই. এম. ফরস্টারের আমন্ত্রণে সেখানে গিয়েছিলেন। বয়সের বড় রকমের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও ক্লের-এর কথাবার্তা ও বিবিধ গুণাবলী তাঁকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করেছিল। ক্লের-এর কাছ থেকে তিনি ফরাশি সংস্কৃতি ও সৌন্দর্যবোধ সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পেরেছিলেন। কম বয়সে এই মহিলা এমন আকর্ষণীয় ছিলেন যে রুশ কবি মায়াকোভস্কি, মার্ক শাগাল, অঁদ্রে মাল্‌রো প্রমুখ অনেকেই তাঁর প্রতি প্রেমাসক্ত হয়ে পড়েন বলে শোনা যায়। অবশ্য ফরাশি-জার্মান যুগ্ম সংস্কৃতির সন্তান, পরাবাস্তবতাবাদের অগ্রদূত ইভঁ গল

(১৮৯১-১৯৫০) হয়ে পড়েন ক্লের-এর জীবন দেবতা। আমৃত্যু (১৯৭৬) তিনি ইভঁর স্মৃতি লালন করেছেন এবং তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত থেকেছেন। দু'জনের গভীর সম্পর্কের নির্যাস তাঁদের *প্রেমের কবিতা* যা অনুবাদ করেছেন ভ্রাতৃযুগল সৈয়দ আলী আহসান ও সৈয়দ আলী আশরাফ। (১৯৫৮ সালে করাচী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তা প্রকাশিত হয়)। অধ্যাপক আহসান যতবার প্যারিসে গেছেন ততবারই ক্লের-এর সঙ্গে কিছু সময় কাটিয়েছেন। প্রথমবার তিনি অধ্যাপককে ফরাশি রান্না ও খাদ্য গ্রহণের শিল্প বিষয়ে পাঠদান করেছেন। তারপর তরুলতার বাগান (জার্দ্যাঁ দে প্লঁৎ হয়ে প্যারিসের প্রখ্যাত মসজিদের কাছে এলে ক্লের পল তাঁকে প্রশ্ন করেন, 'তোমার মুসলিম বিশ্বাসের বিশিষ্টতা কী? সৈয়দ সাহেব জবাব দিয়েছিলেন, 'এক কথায় বলতে গেলে বলতে হয় – পরিচ্ছন্নতা, কর্মে ও সাধনায়, চিন্তায় ও বিশ্বাসে, মানবিক সম্পর্কে বিশুদ্ধ হওয়া।' অবশ্য তাঁর লক্ষ্য ছিল ক্লের-এর কাছ থেকে ইউরোপের আধুনিক শিল্প ও কাব্য জগৎ সম্পর্কে সম্যক অবহিত হওয়া। একটি রচনায় তিনি যে তাঁকে মাতৃসম জ্ঞান করেন তা জানিয়েছেন এবং আজীবন গভীর শ্রদ্ধা ও মমতায় তাঁর স্মৃতি লালন করেছেন।

ক্লের-এর মতো একই অনুষ্ঠানে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিতি হন অঁদ্রে শঁসোঁ (André Chamson)'র সঙ্গে। শঁসোঁ ছিলেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালের মুক্তিযোদ্ধা। অঁদ্রে মাল্‌রো তথা কর্ণেল বেরজের অধীনে প্রত্যক্ষ যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেছেন। পরে তিনি লেখকরূপে খ্যাতি অর্জন করেন এবং ফরাশি একাডেমীর 'অমর' চল্লিশ সদস্যের অন্যতম হবার সুযোগ লাভ করেন। সেই সুবাদেই অধ্যাপক আহসানকে প্যারিস উপভোগ করবার ব্যবস্থা করে দেন বাস্তিই দিবসের উৎসব দেখার জন্য একটি ভিআইপি আসন, প্রমোদতরী চড়ে 'সেন' প্রদক্ষিণ, ফুকেৎ রেস্তোরঁর 'রক অয়েস্টার' খাবার নিমন্ত্রণ এর অন্যতম। তাঁর সঙ্গে অধ্যাপকের শেষবার দেখা যায় ২৩শে অক্টোবর, ১৯৭৩। 'উচ্ছল ও প্রাণদীপ্ত শঁসোঁ তাঁকে সেবার তাঁর আত্মজীবনীর ইংরেজি অনুবাদ *টাইম টু কিপ* বইটি উপহার দেন। অধ্যাপক আহসানের মতে, '... একটি পরিশীলিত সম্ভ্রান্ত এবং সম্পন্ন ফরাশি চিত্তকে আমার সামনে উদ্ঘাটন করেছিলেন অঁদ্রে শঁসোঁ।'

অন্যদিকে সমবয়সী বন্ধু হিসেবে ফ্রান্সের সঙ্গে একটি 'হৃদয়গ্রাহ্য সংলাপ নির্মাণের চেষ্টা করে ছিলেন জঁ্য দ্য বের (Jean de Beer)। ১৯৫৪-র দিকে ঢাকায় যে পিইএন সম্মেলন হয় তাতে বের তাঁর স্বদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন। সেই থেকে শেষ অবধি দু'জনের মধ্যে গভীর প্রীতির সম্পর্ক বজায়

থাকে। প্যারিসে এসে অধ্যাপক আহসান কয়েকবার পিইএন পরিচালিত 'মেজোঁ অ্যাঁতেরনাসিয়নাল' তথা আন্তর্জাতিক ভবনের অতিথি হয়েছিলেন। বের ছিলেন এই বাড়িটির দায়িত্বে। নাট্যকার ও চিত্রপরিচালক বের ভয়ানক ব্যস্ত মানুষ। প্রথমবার প্যারিসে অধ্যাপক আহসানের সঙ্গে তাঁর বন্ধুর সাক্ষাৎ ঘটে রাত এগারোটায়, 'কমেদি ফঁসেজ' নামক বিখ্যাত থিয়েটার হলের সামনে 'কাফে রয়াল'-এ। সেই সাক্ষাৎ সম্পর্কে শোনা যাক :

> ফরাশিদের আন্তরিকতার একটা বহিঃপ্রকাশ আছে – দ্য বের-এর মধ্যে তা আমি প্রচুর লক্ষ্য করেছি। দু'হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরবে, গালে চুমু খাবে, রহস্য করবে, রসিকতা উপভোগ করে প্রাণ খোলা হাসি হাসবে। ইংরেজরা যেখানে আত্মশাসিত, ফরাশিরা সেখানে আত্মমুখর।

দ্য বের অধ্যাপক আহসানকে প্যারিসের একটি বিশিষ্ট রূপ – যাকে বলা হয় 'প্যারিস বাই নাইট' পর্যটকদের রাতের প্যারিস নয়, ফরাশি বুদ্ধিজীবীদের অনুভববেদ্য মধ্যরাতের প্যারিস দেখানোর জন্য নিয়ে গেলেন মোমার্তে। সব খুঁটিয়ে দেখছেন অধ্যাপক আর স্মৃতির ভান্ডার পূর্ণ করছেন। অনেক পরে ১৯৮৬ সালে প্রকাশিত *প্রেম যেখানে সর্বস্ব* গ্রন্থে তিনি তা বর্ণনা করেছেন। বের-এর বাড়িতে স্বামী-স্ত্রী তাঁকে যে অনানুষ্ঠানিক আন্ত রিকতায় গ্রহণ করতেন, সে গল্প অনেকবারই স্বজনদের সামনে করতেন তিনি।

দ্য বের-এর সৌজন্যে অধ্যাপক আহসান বহু ফরাশি বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ মিলনের সুযোগ পেয়েছিলেন। একটি ভোজ সভায় তিনি সে সময়কার উদীয়মান কথা-সাহিত্যিক ফ্রঁসোয়াজ সাগঁকে দেখেছিলেন এবং তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে, 'দার্শনিক, তত্ত্বজ্ঞ, নতুন চিন্তার প্রবক্তা, মার্কসবাদী ইত্যাদি অনেক কিছু হয়েও ফরাশি কবি ও সাহিত্যিকগণ মূলত ফরাশি ভাষায় দক্ষ কারুকর্মী। তাঁরা ভাষাকে এক-একটি বিশিষ্ট সত্তায় সচল ও সংক্রামক করতে চান।' তিনি আরো দেখেছেন যে, 'চিন্তার উৎস মূলে ক্যাথলিক বিশ্বাস থাকলেও কবি পোল ক্লোদেল, ঔপন্যাসিক ফ্রঁসোয়া মোরিয়াক শিল্প কুশলতার অভিজ্ঞানের দ্বারাই শাসিত হয়েছেন। এঁরা এটা প্রমাণ করতে চাননি যে ধর্মের দ্বারাই মানবচিত্তে প্রশান্তি আসে এবং পৃথিবীর সঙ্গে মানুষের একটি ব্যবহারগত সঙ্গতি নির্মিত হয়। একটি কথাই আমার কাছে চূড়ান্ত বলে মনে হয়েছে : ফরাশি লেখকগণ ভাষাকেই সর্বপ্রকার প্রকাশের জয়শ্রী ভেবেছেন। কবিতার ক্ষেত্রে বোদলের থেকে আরম্ভ করে পিয়ের এমানুয়েল পর্যন্ত সকলেই শব্দের উত্তাপে উষ্ণ হয়েছেন এবং পরিচ্ছন্ন উচ্চারণে জীবনকে বাঙময় করেছেন।'

প্রথমবার প্যারিসে গিয়ে প্রথম দিন বিকেল পাঁচটায় তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন মাদমোয়াজেল ল্যুস ক্লোদ মেৎর : অনেকটা জিপসি ধরনের চেহারা, সুস্পষ্ট চোয়াল, প্রশস্ত ললাট, সুচিহ্নিত কণ্ঠাস্থি, আয়ত নেত্রের মণি নীল। কালো জামা গায়ে, জামার প্রান্তদেশ সোনালী সুতার কাজ করা। গলায় কাঠের গোলকের মালা, অনেকটা আমাদের দেশের রুদ্রাক্ষের মালার মতো। রাত এগারোটায় জঁ দ্য বের-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটবে এবং ততক্ষণ ল্যুস তাঁকে সঙ্গ দেবেন। তাঁরা এক সঙ্গে রাতের খাবার খেলেন। পরে দুজন গেলেন তুইলরি বাগানে : 'সেখানে ঝরা পাতার উপর হেঁটে যেতে বেশ রহস্যময় লাগলো। বাগানটির একটি পুরাতন অপরিবর্তনীয় রূপ আছে। ... উল্লেখযোগ্য অনেক শিল্পীর ভাস্কর্য কর্মের নিদর্শন হিসাবে বাগানটি এখানে স্থাপিত হয়েছে। বাগানটির বৃক্ষশোভার সঙ্গে এগুলো যে সবসময় সংগতি রক্ষা করে তা নয়, কিন্তু পুরাতন ইতিহাসের প্রশান্তি হিসাবে এগুলো যেভাবে ছিলো এখনও সেভাবেই আছে। এ বাগানের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ভাস্কর্য কর্ম হচ্ছে মাইয়লের অর্ধশায়িত রমণী মূর্তি। মূর্তিটি সেজানের সম্মানার্থে নির্মিত।'

ল্যুস এক সময় পাকিস্তান দূতাবাসে কাজ করেছেন। ইকবাল সম্পর্কে দুটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। তাঁর একটি প্রবন্ধে রয়েছে নজরুল ও জসীম উদ্দীনের ওপর আলোচনা। এক সময় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর কয়েকটি গল্পও তিনি অনুবাদ করেন। ১৯৬১/৬২ সনে বর্তমান লেখকের সঙ্গে তিনি যৌথভাবে সৈয়দ আলী আহসানের *অনেক আকাশ* থেকে কয়েকটি কবিতার ভাষান্তরে আত্মনিয়োগ করেন কিন্তু অনূদিত কবিতাগুলো পরে হারিয়ে ফেলেন।

ফ্রান্সের একজন প্রসিদ্ধ বুদ্ধিজীবী রজে কাইওয়া। দীর্ঘদিন তিনি ইউনেস্কোর ভাষা-সাহিত্য বিভাগের প্রধান ছিলেন। একজন দার্শনিক ও দক্ষ অনুবাদক কাইওয়া দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকে লাতিন আমেরিকার সাহিত্য ফ্রান্স তথা ইউরোপে পরিচিত করবার প্রয়াস নেন। তিনি বর্তমান লেখকের রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক একটি প্রবন্ধ এবং *বাংলা মরমী কবিতার* ওপর একটি বই ইউনেস্কো থেকে ফরাশিতে প্রকাশের ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। অধ্যাপক আহসান তাঁর অনুরোধে দু'বার তেহরান ও টোকিওতে ইউনেস্কো সেক্রেটারিয়েটের উপদেষ্টারূপে কাজ করেছিলেন এবং শেষবার ফ্রান্সে গেলে তাঁকে তাঁর *পাথর* বইটি উপহার দেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, কাইওয়ার বড় শখ ছিল দেশ-বিদেশের পাথর সংগ্রহ এবং এ সম্পর্কে তাঁর রয়েছে বহু রচনা।

পিয়ের এমানুয়েল একজন সংবেদনশীল কবি। তাঁর সঙ্গে সৈয়দ আলী আহসানের যোগাযোগ ঘটে কংগ্রেস ফর কালচারেল ফ্রিডমের কার্যালয়ে। একাত্তরের দুর্দিনে তিনি তাঁর কথা স্মরণ করেন এবং আগরতলা থেকে বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের অবস্থান সম্পর্কে এক পত্র দেন। পিয়ের দ্রুত তাঁকে সমর্থনসূচক জবাব দেন এবং ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে কিছু অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা করেন। অধ্যাপক আহসান *তাঁর যখন সময় এল* গ্রন্থে এ সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। এক সময় আন্তর্জাতিক পিইএন-এর প্রেসিডেন্ট রনে তাবেরনিয়ের সঙ্গেও ছিল তাঁর সখ্যতা। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু ও পাকিস্তানী সভ্যতার অধ্যাপক অঁদ্রে গ্র্যাঁব্রতিয়ের একজন কবি। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ও বর্তমান লেখকের সূত্রে সম্ভবত তাঁর সঙ্গে দু'বার সাক্ষাৎ ঘটে অধ্যাপক আহসানের। ১৯৭৩ সালে ফ্রান্স সফরে গেলে তিনি হিন্দী অবধি বিশেষজ্ঞ শার্ল ভোদভিলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। মাদাম ভোদভিল অধ্যাপনা ও গবেষণার কাজে ৬ মাস প্যারিসে ও ৬ মাস বেনারসে কর্মরত থাকতেন। মালিক মুহাম্মদ জয়সীর *পদ্মাবতী* সম্পর্কে তাঁর মূল্যবান প্রবন্ধ রয়েছে। তাছাড়া কবিরের অনুবাদ ও মূল্যায়ন তাঁকে দিয়েছে খ্যাতি। সবশেষে আমরা উল্লেখ করবো দীর্ঘদেহী, উজ্জ্বল এবং উৎফুল্ল ভ্লাদিমির নবোকতের কথা। তিনি অধ্যাপক আহসানকে প্যারিসের স্বল্প পূবে স্যাঁ লিস শহরে নিয়ে যান নিজের বাড়িতে আতিথেয়তা দেবার মানসে। অধ্যাপক আহসানের উপলব্ধি ঘটে যে, 'পৃথিবীর আর কোনও দেশ মানুষকে ফ্রান্সের মতো বিস্ময়কর অজস্রতায় পুলকিত ও চঞ্চল করে না।'

অর্লি বিমান বন্দর থেকে নেমে আঁভালিদের উন্মুক্ত ময়দান পেরিয়ে শঁজেলিজের পত্রশোভিত অনবদ্য ও জীবনময় দৃশ্যাবলী দেখে বহু বিচিত্র ও বিদগ্ধ মানুষের সাহচর্যে লাভ করে সৈয়দ আলী আহসান নিজেকে যেমন সমৃদ্ধ করেছেন তেমনি তাঁর অনেক রচনায় সেসব কাহিনী পরিবেশন করে আমাদের জন্য রেখেছেন অপরূপ আনন্দ সামগ্রী। ফ্রান্সে গিয়ে সেখানকার কবি-সাহিত্যিকদের সঙ্গে মিলে তাঁর ধারণা জন্মেছে যে, 'এখানকার মানুষ চিন্তারাজ্যের সতত পরিবর্তনশীল জিজ্ঞাসার মধ্যে বাস করে।' তাঁর এই বোধের কারণেই সম্ভবত আশি বছর বয়স পেরিয়েও তিনি সর্বমুহূর্তে নিজেকে জিজ্ঞাসার বৃত্তে সচল রেখেছিলেন।

সুগভীর জাপান উপলব্ধি

আজ থেকে প্রায় বিশ বছর আগে অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান তাঁর *প্রেম যেখানে সর্বস্ব* শীর্ষক গ্রন্থের প্রাসঙ্গিক তথা ভূমিকায় লিখেছেন :

> জীবনকে নির্ণয় করা বড় কঠিন। কখন কোন সৌভাগ্যে যে হৃদয় উন্মুক্ত হবে (তা) আমরা জানি না কিন্তু যখন হয় তখন সকলকেই আমরা প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করি। জীবনে প্রীতির সুনিশ্চয়তা নির্মাণের জন্য আমি চিরদিন ব্যাকুল ছিলাম। (ঢাকা, হাক্কানী, ২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৬)।

সেই ব্যাকুলতা যে তাঁকে দেশ ও বিদেশের একাধিক সংস্কৃতির সঙ্গে অন্তরঙ্গতা স্থাপনে উদ্বুদ্ধ করেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এখন আমরা বিশেষ করে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, ইরান ও জাপানের প্রতি তাঁর অনিরুদ্ধ আগ্রহের কথা স্মরণ করতে পারি।

জাপানী সংস্কৃতির প্রতি তাঁর আগ্রহ ঘটেছে ছাত্রজীবনে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজীতে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে অধ্যয়নকালে সাহিত্যগতপ্রাণ সৈয়দ আলী আহসান পদ্ধতিগতভাবেই ইউরোপীয় ও অন্যান্য বিদেশী সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হন। অল্প বয়সেই তিনি জাপানী 'নো' নাটকের অনুসরণে বাংলায়ও কিছু রচনা করতে প্রয়াসী হন। কিন্তু যথার্থভাবে সে দেশের সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর অনুধ্যান শুরু হয় ১৯৫৭ সালে প্রথমবার জাপান সফরের পর। সেবারই জাপানী সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর 'কিছুটা ধারণা জন্মে'। কেননা 'সৌভাগ্যক্রমে' তিনি তখনকার কয়েকজন প্রখ্যাত জাপানী লেখকের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। এঁরা হলেন কাওয়াবাতা ইয়েসুনারি, তাকামি জুন, তানাজাকি ইউনিচিরো এবং মিশিমা ইউকিও (দ্রঃ কথা *বিচিত্রা : বিশ্বসাহিত্য;* শিখা : ২০০১, পৃঃ ৩৪) এছাড়া জাপানের একজন শিল্পী, কয়েকজন সাংবাদিক, দু'চারজন সাধারণ মানুষ এবং বেশকিছু সাহিত্যকর্মের সাথে তাঁর পরিচয় ঘটে। তিনি আরও বিশেষভাবে ভাগ্যবান; কেননা সেবারই তিনজন জাপানী ভাষা-সাহিত্য-

ইতিহাস বিশেষজ্ঞ মার্কিন পন্ডিত ডোনাল্ড কীন, এডওয়ার্ড জি. সাইডেনস্টিকার, হার্ভার্ড পাশিনের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ও বন্ধুত্বলাভের সুযোগ হয়। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার তিনি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কেননা সহজভাবে ইংরেজি ভাষা ব্যবহারে এই যোগাযোগ হতে পেরেছিল পূর্ণাঙ্গ। টোকিওতে পিইএন আয়োজিত আন্তর্জাতিক লেখক সম্মেলনে যোগ দিতে গেলে অধ্যাপক আহসানের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল ইম্পিরিয়াল হোটেলে। সেখানে তাঁর কক্ষসঙ্গী ছিলেন ডোনাল্ড কীন, নিউইয়র্কের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ইতোমধ্যে একজন খ্যাতনামা অনুবাদক। বলাবাহুল্য, তিনি জাপানী জীবন ও সংস্কৃতির একটি মহার্ঘ পরিচিতি পাশ্চাত্যের কাছে তুলে ধরেছিলেন। তাই যে ক'দিন অধ্যাপক আহসান সেবার জাপানে ছিলেন, সে ক'দিন প্রত্যহ তাঁর সঙ্গে কিছুটা সময় কাটিয়েছেন এবং কথাবার্তার মাধ্যমে জাপানী জীবনচেতনা সম্পর্কে তাঁর কাছে অনেককিছু জানতে পরেছেন। (ঐ; পৃঃ ৪২) দ্বিতীয়বার যখন নিউ-ইয়র্কের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৮৩ সালে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে, তখন কীন তাকে বলেছিলেন :

> পৃথিবীতে নিজস্ব পরিচয় নিয়েই জাপানকে বেঁচে থাকতে হবে। কিন্তু তবুও জাপান আধুনিক সময়ে বাস করতে চাইবে এবং আধুনিককে গ্রহণ করবার অধিকারও লাভ করবে। (ঐ; পৃঃ ৪৫)।

বস্তুত জাপানে ঐতিহ্যপ্রিয়তা ও আধুনিকতার যে সংমিশ্রণ, নিজস্ব সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের সংরক্ষণ সৈয়দ আলী আহসানের কৌতুহলী দৃষ্টিতে তা যেমন আকর্ষণীয়, তেমনি প্রবলভাবে শিক্ষণীয়ও মনে হয়েছে। জাপান সম্পর্কে অনেক কথা তিনি বলতেন, বেশকিছু লিখেছেনও। শেষের দিকে যোগাযোগ কিছুটা বিচ্ছিন্ন হয়েছিল; শুধুমাত্র দুটি গ্রন্থে : প্রথমটি *প্রেম যেখানে সর্বস্ব* (১৯৮৬) গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে – "জাপানে (ক) টোকিওর একটি রেস্তোরাঁয়, (খ) প্রথাবদ্ধ জীবন এবং ইয়েসুনারি কাওয়াবাতা, (গ) টোকিওতে জন স্টেইনবেক (পৃঃ ৬৯-৮৪)।" দ্বিতীয় *কথাবিচিত্রা : বিশ্বসাহিত্য* (২০০১) গ্রন্থে রয়েছে চারটি ছোট প্রবন্ধ : "জাপানী সাহিত্যে কেনজাবুরো ওয়ে", "কেনজাবুরো ওয়ে : তাঁর নিঃশব্দ আর্তনাদ", "তানাজাকি ইউনিচিরো এবং তাঁর উপন্যাস" এবং "ওসামু দাজাই ও তাঁর উপন্যাস"।

১৯৫৭ সালে জাপানী সাহিত্যের সবচেয়ে স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব ইয়েসুনারি কাওয়াবাতার সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন অধ্যাপক আহসান। জাপানী পিইএন

ক্লাবের সভাপতিরূপে তিনি টোকিওর সানেকি কাইকান ভবনে কাকুসাই কক্ষে অন্যান্যের মধ্যে তাঁকেও অভ্যর্থনা জানাচ্ছিলেন। "একটি কালো কিমোনো পরিহিত শীর্ণকায় কাওয়াবাতাকে নিঃসঙ্গ ও নিরুত্তাপ মনে হচ্ছিলো তাঁর কাছে। দৃষ্টিতে শান্তি এবং বিনয় (যেন) একটি প্রথাগত ভদ্রতার সফল প্রতিচ্ছবি।" *(প্রেম যেখানে সর্বস্ব; পৃঃ ৪২)*

কাওয়াবাতা (১৯৯৯)-র *'সহস্র সারস'* উপন্যাসটি তিনি টোকিওতে অবস্থানকালে পড়েছিলেন। "জাপানের পুরনো প্রথাগত জীবনধারার পটভূমিতে একটি প্রেমের গল্প। উপন্যাসটিতে অনুষ্ঠানগত চা পরিবেশনা বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। পাত্র-পাত্রিরা পুরানো চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকছে। শিল্প-সমৃদ্ধিতে জাপান এখন এতদূর অগ্রসর হচ্ছে যে, এ ধরনের স্তব্ধতা আধুনিককালের পরিপন্থী মনে হয়।" (ঐ; পৃঃ ৭৪) অবশ্য তিনি যথার্থই অনুধাবন করেছেন যে,

> প্রাচ্যের ক্রমবিবর্তনশীল ঐতিহ্যের সমৃদ্ধির চিত্রপট মমতা ও মানবীয় করুণাময় উন্মোচনের জন্য কাওয়াবাতা নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। (ঐ; পৃঃ ৭৭)

কাওয়াবাতাকে তিনি একান্তে পাননি, অনেক ভীড়ের মধ্যে একাকী ও বিচ্ছিন্ন দেখেছেন। তবে একবার হোটেলের লাউঞ্জে আলবের্তো মোরাভিয়া, এঙ্গাস উইলসন, সেই ইতো প্রমুখসহ কিছু আলোচনার সুযোগ ঘটেছিল। প্রসঙ্গক্রমে কাওয়াবাতার একটি উক্তি এখানে উদ্ধৃত করা যায় :

> জাপানী বিবেচনায় অস্তিত্ব অস্বাভাবিক নয়, অনিত্য এবং আমাদের চৈতন্যে একমাত্র মৃত্যুরই অবিনশ্বরতা আছে। আমরা মৃত্যুকে সম্মান করি এবং মৃত্যুকে সচেতনভাবে গ্রহণ করি। ফিউডাল যুগের উপন্যাসে দেখা যাবে একটি ব্যর্থ প্রেমের কারণে দুটি আত্মহত্যা ঘটেছে। এ আত্মহত্যা একটি বিশেষ ধরনের মানসিকতাকে উন্মোচিত করে, যেখানে প্রেম নামক চৈতন্যকে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজনে মৃত্যুকে গ্রহণ করা হচ্ছে। চিত্তকে নিষ্কলুষ রাখার জন্য মৃত্যুকে আমরা সহজেই বেছে নিই। (ঐ; পৃঃ ৭৮-৭৯)

অধ্যাপক আহসান পরবর্তীকালে অধিকতর অধ্যয়ন ও পর্যবেক্ষণের অনুঙ্গে কাওয়াবাতার জীবনে এবং উপন্যাসে একান্ত ব্যক্তিগত সততা এবং নিষ্ঠার প্রতিচ্ছবি প্রত্যক্ষ করেছেন। তাছাড়া তাঁর মতে, "কাওয়াবাতা আপন জীবনেও মৃত্যুর অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সামুরাই নীতিবোধ দ্বারা

এবং অভিষিক্ত হারাকিরির দ্বারা মৃত্যুকে গ্রহণ করেন। কেন জানি না। হয়তো বা জীবনের অনস্তিত্বের অন্তরঙ্গ রূপকে শেষ মুহূর্তে প্রত্যক্ষ করবার ইচ্ছায়।" (ঐ; পৃঃ ৭৯)

তাছাড়া পিইএন-এর ২৯তম কংগ্রেসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ১৯৫৭ সালের ২ সেপ্টেম্বর তারিখে কাওয়াবাতার ভাষণের সমাপ্তি বক্তব্যটিও এখানে প্রণিধানযোগ্য :

> অতীতের সকল সভ্যতা এবং ধর্ম তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষা করেছিলো। বর্তমানে একই পৃথিবীতে তারা পারস্পরিক সম্পর্কে আবর্তিত হচ্ছে। বর্তমানে নতুন হচ্ছে সমন্বয়ের যার ফলে বিশ্বব্যাপী একটি সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সম্মুখীন আমরা হচ্ছি। (ঐ; পৃঃ ৮০)

অধ্যাপক আহসান উল্লেখ করেছেন যে, তাকামি জুনের সঙ্গে তাঁর গভীর বন্ধুত্ব গড়ে উঠে। সম্ভবত তিনি একবার ঢাকায়ও এসেছিলেন। "তাকামি টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর রচনায় ইংরেজি সাহিত্যের চরিত্রগুলো জাপানী চরিত্রগুলোর সঙ্গে একাকার হয়েছে। কিন্তু এঁদের সময় পর্যন্ত জাপান তাঁর সাহিত্যকে নিজস্ব গোত্রের মধ্যে আবদ্ধ করেছিল।"

এঁদের বলতে তিনি প্রধানত কাওয়াবাতা, তানাজাকি এবং মিশিমার কথা ভেবেছেন। তাঁর মতে, "সে সময় জাপানী লেখকদের সামনে সমস্যা ছিল প্রাচীন বিশ্বাস এবং আধুনিক দ্রুততার মধ্যে একটি সমন্বয় সাধন। এঁদের মধ্যে একমাত্র কাওয়াবাতা অনুভব করেছিলেন যে, প্রাচীন বিশ্বাস. প্রণতি এবং মূল্যবোধ একদিন হারিয়েই যাবে। সুতরাং সেগুলোর প্রতি শেষ অর্ঘ্য নিবেদনের প্রয়োজন আছে। তাই তিনি তাঁর উপন্যাসে অত্যন্ত মন্থরতায় প্রাচীন আরচরণকে মমতার সঙ্গে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন। ... তানাজাকি এবং মিশিমা জাপানী মূল্যবোধের পরিপ্রেক্ষিতে আধুনিক সময়ের উষ্মা এবং ক্রোধকে প্রকাশ করেছিলেন।"

মিশিমার বেশ কয়েকটি বই তিনি পড়ে থাকলেও তাকামির মত তাঁর সম্পর্কেও স্বতন্ত্রভাবে কিছু লিখেছেন বলে মনে হয় না। তবে তানাজাকির ওপর তাঁর একটি প্রবন্ধ ও আলাদাভাবে কিছু মন্তব্য রয়েছে।

তানাজাকি ইউনিচিরো (১৮৮৬) সম্পর্কে ইতোমধ্যে বিশ্বসাহিত্যের পটভূমিতে যাঁরা মর্যাদার আসনে বসেছেন, তিনি তাঁদের অন্যতম। তাছাড়া তাঁর মতে, জাপানে এখন বিতর্ক চলছে কাওয়াবাতা ও তানাজাকির মধ্যে কে বড় এবং প্রথম নোবেল পুরস্কারটি তানাজাকিরই পাওয়া উচিত ছিল,

ইত্যাদি বিষয়াদি। এরপরও তাঁর এমন মন্তব্য রয়েছে যে, জাপানকে জানার জন্য তানাজাকির লেখা 'সবচেয়ে বড় সহায়' (ঐ; পৃঃ ৩৯) উপযুক্ত বিশ্লেষণের পর আমরা পাই তাঁর সিদ্ধান্ত :

> তানাজাকি শুধুমাত্র একজন বলিষ্ঠ লেখকই নন, তিনি একজন মহৎ লেখকও। জাপানী ঐতিহ্যকে গ্রহণ করার ফলে তিনি নিজেকে স্পর্শকাতর আধুনিকতার বাইরে একটি প্রাজ্ঞ সমীচীন অতীতকে গ্রহণ করতে পেরেছিলেন। তিনি তিনটি সময়কালের মধ্যে নিজের সাহিত্যকর্মকে প্রসারিত রেখেছিলেন। এই তিনটি কাল হচ্ছে – মেইজি, তাইসো এবং সোওয়া। তিনি জাপানের মধ্যযুগীয় কাহিনী "গেনজি" আধুনিক ভাষায় রূপান্তরিত করে প্রকাশ করেন। এক্ষেত্রেও তাঁর উদ্দেশ্য ছিল পুরাতনকে আধুনিক বিশ্বাসের মধ্যে টেনে আনা। (ঐ; পৃঃ ৪০)

তানাজাকির সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস *মাকিওকা ভগ্নী চতুষ্টয়* নিয়ে তিনি বিস্তৃত আলোচনা করেছেন,

> এই উপন্যাসের মধ্যে যুদ্ধবিধ্বস্ত জাপানের অসহায়তা, আবার সঙ্গে সঙ্গে অভিমান এবং গর্বকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। যুদ্ধের পূর্ববর্তী সময়ে ওয়াসাকার উচ্চবর্গের মানুষদের জীবনের মধ্যে যে আনন্দ উচ্ছলতার বন্যা ছিল, তার একটি চিত্র এই উপন্যাসে দক্ষতার সঙ্গে অঙ্কিত হয়েছে। এক সময় যারা অত্যন্ত ধনী ছিলেন এবং গর্বিত ছিলেন তাঁদের জীবনচিত্রকে দক্ষ শল্য চিকিৎসকের মত তিনি ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দেখিয়েছেন। এক সময় প্রবলভাবে ধনী এবং সে কারণে উদ্ধত চার ভগ্নী চরিত্রকে তিনি বিশ্লেষণ করেছেন গভীর নিপুণতার সঙ্গে। কিন্তু কোথাও নিষ্ঠুর কোন মন্তব্য নেই। বাস্তবকে তিনি নিজস্ব অভিধায় চিত্রিত করেছেন। ... এই উপন্যাসটি একই সঙ্গে একটি নিপুন শিল্পকৃতি, আবার একটি সময়ের যথার্থ ইতিহাস। তানাজাকি অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে শিল্প এবং ইতিহাসকে সমন্বিত করেছেন। তিনি কবিতার আবেগ ও ভাবপ্রকল্প নিয়ে একটি সময়কালের পদচারণাকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। (ঐ; পৃঃ ৪০-৪১)

পরবর্তী বিবেচনার বিষয় হল, ওসামু দাজাইর একটি উপন্যাস। ওসামু দাজাই (আসল নাম সুজি সুশিমা, ১৯০৯) ও তাঁর উপন্যাস *'অস্তগামী সূর্য'* (ইংরেজি অনুবাদ ডোনাল্ড কীন ১৯৫৬, বাংলা অনুবাদ নূরুল হুদা) সম্পর্কে অধ্যাপক আহসানের অভিমত হলো :

> জাপানের নিজস্ব ভাবাদর্শ থেকে পাশ্চাত্য (গ্রন্থে ভুলক্রমে 'প্রাচ্য' ছাপা হয়েছে) ভাবাদর্শে যাবার একটি প্রক্রিয়া এতে দেখানো হয়েছে। এ উপন্যাসে সংশয়ের কথা আছে, আগ্রহের কথা আছে এবং পরিবর্তিত ব্যবস্থায় জাপানের অবস্থানের চিত্র আছে। এই উপন্যাসের মধ্যে ওসামু দাজাই একটি জাতির ট্রানজিশন দেখিয়েছেন ফিউডাল যুগ থেকে উত্তরণের। জাপানের যে বিদায়ী ফিউডাল যুগের মানুষ তাকে দাজাই বলেছেন – *'অস্তগামী সূর্যের মানুষ'*। এ কথাটি জাপানী সাহিত্যে এখন চালু হয়ে গেছে। এ উপন্যাসের নায়িকা কাজুকো জাপানের একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে। সে তার বংশমর্যাদা অস্বীকার করে আধুনিক সময়ের প্রয়োজনে নতুন প্রজন্মের মানুষ হতে চেয়েছে। উপন্যাসের মধ্যে পাশ্চাত্য ভাবধারা জীবনের মধ্যে এসে পড়েছে; কিন্তু পুরোপুরি তারা এখনো পাশ্চাত্য জগতের মানুষ হয়ে উঠেনি। বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে লেখক এ অবস্থাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। আবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি দেখিয়েছেন যে, কি করে পাশ্চাত্যের আদর্শ সনাতন আদর্শকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। (ঐ; পৃঃ ৪৩)

দাজাইর এক নায়িকার সংলাপে আছে – 'একজন সংগ্রামী পরাজিত ব্যক্তিত্বই হচ্ছেন সবচেয়ে সুন্দর।' অবশেষে তাই কি তিনি স্বস্তির সন্ধানে শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করতে উদ্বুদ্ধ হন? কয়েকবার আত্মহত্যার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে তিনি অবশেষে তাঁর প্রেমিকাকে নিয়ে নদীতে ডুবে মারা যান।

অধ্যাপক আহসান সংক্ষেপে জাপানী ঔপন্যাসিকদের কথা বলেছেন, প্রয়োজনে কিছু তুলনামূলক আলোচনাও করেছেন। এতে আমাদের বোধগম্যতার দ্বার প্রশস্ত হয়। পূর্বাহ্নে তিনি লিখেছিলেন,

> কাওয়াবাতা এবং তানাজাকির উপন্যাসে প্রথাসিদ্ধ জাপানী রুচি, সম্ভ্রমবোধ এবং আচরণের অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। *(প্রেম যেখানে সর্বস্ব;* পৃঃ ৭৭)

পরে তানাজাকি ও দাজাই'র তুলনা প্রসঙ্গে তিনি লেখেন,

> তানাজাকির সঙ্গে দাজাইয়ের পার্থক্য এখানে যে, তানাজাকি সময়ের একটি বিরাট প্রেক্ষাপট গ্রহণ করেছেন। সে প্রেক্ষাপটে মধ্যযুগ থেকে আধুনিক সময় পর্যন্ত জাপানের একটি পরিবর্তন চিত্রিত হয়েছে, কিন্তু দাজাই বর্তমান সময়কেই গ্রহণ করেছেন এবং বর্তমান সময়ের দ্বন্দ্বকে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন।

তানাজাকি অবশ্য খুবই বড় মাপের লেখক। কিন্তু দাজাই তানাজাকির সমতুল্য না হলেও তাঁর ক্রোধ এবং ক্ষুব্ধতায় তিনি আধুনিক সময়ের যথাযোগ্য প্রতিনিধি, কেনজাবুরো ওয়ে, যিনি এ বছর নোবেল পুরস্কার পেলেন, তিনি যে নতুন ধারা জাপানী সাহিত্যে আনলেন, তার সুত্রপাত কিন্তু দাজাই করেছিলেন। (*কথাবিচিত্র*; পৃঃ ৪৫)

কেনজাবুরো ওয়ে (১৯১৫) শুধু জাপানের জন্য কেন, বিশ্বসাহিত্যেই এজন ভয়ংকররূপে ব্যতিক্রমী লেখক। অধ্যাপক আহসান তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করার আগে জাপানী সাহিত্যধারাকে আবার অধ্যয়ন করলেন। অতঃপর জানালেন, কেনজাবুরো ওয়েই প্রথম ব্যক্তি, যিনি তাঁর উপন্যাসে মানুষের অন্তর্লীন চিন্তাধারাকে প্রাসঙ্গিক করলেন। মানব মনের চিন্তার স্রোতধারা আছে, যা প্রকাশ্যে স্বাভাবিকভাবে কখনই উচ্চারিত নয়। সেই স্রোতধারাকে পাশ্চাত্যের লেখকরা রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন। এদের চিন্তাধারা, বিষণ্নতা ও অস্তিত্ববাদ ওয়েকে অসম্ভবভাবে প্রভাবিত করেছে এবং তিনি অত্যন্ত সফলভাবে এ ভাবপ্রকল্পকে গ্রহণ করে জাপানী সাহিত্যে একটি নতুন সঞ্জীবনী শক্তি এনেছেন।

অধ্যাপক আহসানের মতে, সার্ত্র, মেইলার ও মিলারের প্রভাব ওয়ের উপর রয়েছে। ওয়ের ব্যক্তিগত বিষয় উপন্যাসটির চরিত্র একটি ভয়ানককে প্রত্যক্ষ করেছে এবং বিকারের সম্মুখীন থেকে জীবনকে পরিচালিত করেছে।

এই উপন্যাসটি লিখতে গিয়ে তিনি জাপানী ভাষার অন্বয় পদ্ধতি ভেঙে ফেলেন এবং উপমা ও রূপকের প্রবৃত্তির পরিবর্তন ঘটান। জাপানী ভাষা ওয়ের হাতে একটি নতুন ভঙ্গিতে প্রতিষ্ঠিত হয়।

তবে অধ্যাপক আহসানকে প্রত্যক্ষভাবে আলোড়িত করেছে ওয়ের *'নিঃশব্দ আর্তনাদ'* গ্রন্থটি। এ গ্রন্থের মধ্যে চিন্তার সুপ্তধারা উন্মোচনের একটি প্রয়াস আছে এবং মানুষের অস্তিত্বের নিগুঢ়তম প্রকোষ্ঠে যে সমস্ত বিক্ষুব্ধ ভাবনা-চিন্তা সংরক্ষিত থাকে সেগুলোর প্রকাশ ঘটেছে। উপন্যাসটিতে মূলত কোন কাহিনী নেই। উপন্যাসটি হচ্ছে দুই ভ্রাতার কথা যারা চিন্তাধারা এবং কামনা-বাসনায় এক অন্যের সঙ্গে অসঙ্গত। দুই ভ্রাতা একে অন্যের কাছে আসতে চায়, কিন্তু তাদের অনুভূতিগত বৈলক্ষণ্য তাদেরকে একে অন্যের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। অবশ্য তারা কেউ কাউকে হত্যা করে না কিন্তু জেনে নেয় যে, অস্তিত্বটা এমনই। অস্তিত্বের আশ্চর্য ব্যাখ্যা কেনজাবুরো ওয়ে যেভাবে দিয়েছেন, তাতে তাঁকে সার্ত্র এবং আলবের কাম্যুর সহযাত্রী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। দ্বিতীয় আরেকটি

প্রবন্ধে অধ্যাপক আহসান বিষয়টি দিয়ে আরও বিস্তৃত আলোচনা করেন। তিনি বলেন, "এই উপন্যাসটি প্রথম জাপানী উপন্যাস, যা মানুষের চিন্তায় পাশ্চাত্য বিশ্লেষণকে অবলম্বন করেছে। মানুষ যখন চিন্তা করে, তখন এই সঙ্গে অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ জাগরিত হয়। এই তিনটি অবস্থার সমন্বিত প্রকাশ ভাবনাকে একটি জটিলতায় আবদ্ধ করে।" (ঐ; পৃঃ ৩৬) তাঁর মতে,

> উপন্যাসটির নামের একটি বিশেষ অর্থ আছে। মানুষের আর্তনাদের প্রতিটি উচ্চারণের পরে একটি নিঃশব্দতা আছে। এই নিঃশব্দতার কথা কেনজাবুরো বলেছেন। আর্তনাদটি হল অস্তিত্বের পুঞ্জীভূত বেদনার আর্তনাদ এবং নৈঃশব্দ হচ্ছে এমন একটি অবস্থিতি, যাকে অনুভব করা যায় না। কিন্তু যদি কেউ তাকে অনুভব করতে পারে, তবে তার মুক্তি অবশ্যই আসবে। এই যে জটিল প্রপঞ্চ-এর থেকে কোন মানুষের উদ্ধার নেই। (ঐ; পৃঃ ৩৭)

কিন্তু এই জটিল আধুনিক জীবনের আগে এবং পাশে একটি সরল, আদর্শায়িত জীবনও জাপানে রয়েছে। ১৯৫৭ সালে তাই উপভোগ করেছেন অধ্যাপক আহসান, এমনকি ১৯৬৬ সালেও যখন তিনি দ্বিতীয়বার জাপান সফর করেন তখনও। কিন্তু সেবার তিনি ব্যস্ত থাকলেন ইউনেস্কোর পুস্তক বিষয়ক কর্মশিবিরের উপদেষ্টার দায়িত্ব পালনে। দেশে তখন তিনি বাংলা একাডেমীর পরিচালক (যা এখন মহাপরিচালক)। টোকিওতে তিনি প্রকাশনা ও বিতরণ বিষয়ক নানা আন্তর্জাতিক জটিলতা হয়তো মাথা ঘামিয়েছেন প্রচুর, কিন্তু স্বচ্ছন্দে আগের মতো জাপানী জীবনধারা থেকে রস আহরণে সক্ষম হননি বা অন্ততঃ তার কোন প্রত্যক্ষ প্রতিবেদন আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি। জাপানের প্রতি সশ্রদ্ধ অনুরাগ অবশ্য সক্রিয় ছিল বলে আরো বিশ বছর পরও যখন তিনি প্রথমবারের অভিজ্ঞতা দিয়ে লিখলেন এবং প্রায় আরো এক দশক পর কেনজাবুরো ওয়ে সম্পর্কে পড়ালেখা করলেন।

জাপানী সাংস্কৃতিক বিশিষ্ট কতকগুলো দিক তাঁর দৃষ্টিগোচর হয় প্রথমবারেই। সে ব্যাপারে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছেন সত্তর বছরের 'জীবন রসিক' শিল্পী ইচিরো ফুকোজওয়া। তিনি তাঁকে এক বিশেষ রেস্তোরাঁয় নিয়ে গেলেন। সেখানে বাজপাখির সাহায্যে ধরা বুনো হাঁস এবং ছোট ছোট পাহাড়ি পাখি বিশিষ্ট প্রক্রিয়ায় রান্না করা হয়। অধ্যাপক আহসান বুনো পাখির বুকের মাংস, পাখনা, কলিজা এবং চামড়া ভাজা, পাহাড়ি এলাকার

বুনো সবজি, ভাজা বাচ্চা মৌমাছি, ঘুঘুর মাংসের সুঁপ, অতঃপর নানাবিধ সুস্বাদু সুকিয়াকি পদ্ধতির রান্না উপভোগ করলেন। তাঁর কাছে মনে হল,

> খাদ্যগ্রহণ ও খাদ্য পরিবেশনকে জাপানীরা এক প্রকার সম্ভ্রান্ত অনুষ্ঠান এবং বিনয়-নম্র উপাসনায় পরিণত করেছে। *(প্রেম যেখানে সর্বস্ব;* পৃঃ ৭৩)

সে সময়ে তিনি আরো লক্ষ্য করেছিলেন যে, জাপানী চিত্রকর্মে একটি 'তাৎপর্যবহ শৃঙ্খলাবোধ' রয়েছে। রেখাঙ্কনগুলো অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও দৃপ্ত এবং তুলির আবর্তের মধ্যে সৌন্দর্য ও অর্থময়তা প্রকাশিত ... চিত্রকর্মে যেমন তেমনি সাহিত্যেও আবার জীবন যাপনের ধারাক্রমের মধ্যেও শৃঙ্খলাবোধের সততা এবং বিনয় জাপানী মানসিকতার পরিচয় বহন করছে। তাঁর মতে,

> শৃঙ্খলার প্রতি প্রবণতার ফলে গদ্য রচনার শব্দবিন্যাসের কারুকর্মে কবিতার মতো ধ্বনি-তরঙ্গ নির্মিত হয়েছে। (ঐ; পৃঃ ৭৫)

তাছাড়া তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি যে, জীবনক্ষেত্রেও "মানুষে মানুষে সম্পর্কের মধ্যে দৃশ্যত এক প্রকার ফরম্যাল পোলাইটনেস বা নিয়মতান্ত্রিক ভদ্রতা রয়েছে কিন্তু অন্তরঙ্গ উচ্ছাস নেই" এবং এর কারণও তিনি নির্ণয় করেছেন যে, অতীতের ফিউডাল শাসন ব্যবস্থার কারণে, বহু যুগের নিরুদ্ধতায় জাপানী স্বভাবে এক প্রকার নিঃসঙ্গতা তৈরি হয়েছিলো। (ঐ; পৃঃ ৭৬)

এভাবে আমরা দেখি, অধ্যাপক আহসান বিভিন্ন সূত্রে লব্ধ জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ করে জাপানী সাহিত্যের গোড়া থেকে সাম্প্রতিককাল সম্পর্কে খুবই সংক্ষেপে একটি গ্রহণযোগ্য পটভূমি নির্মাণ করেছেন এবং একই সঙ্গে প্রস্তাব করছেন সাংস্কৃতিক দিকের এক প্রসারিত ব্যাখ্যা যা আমরা সহজে গ্রহণ করতে পারি। তাঁর অনুভবে জাপানের বিশিষ্টতা হচ্ছে :

> জাপান বহির্বিশ্বের সব কিছু নিয়েও নিজস্ব স্বরূপকে অসম্মান করে না। এর একটি কারণ হয়তো যে, জাপানীরা তাদের ধর্মের মৌলিক প্রবৃত্তিকে কখনও অস্বীকার করেনি। বৌদ্ধ ধর্ম ও শিনটো ধর্ম উভয় ধর্মের মধ্যে মৌলিক প্রবৃত্তি হচ্ছে বিনয় এবং নিরহঙ্কার। এ প্রবৃত্তিটা জাপানী মৌলিক প্রবৃত্তির সঙ্গে ওতপোত হয়ে আছে। এ কারণে একজন জাপানী কখনও ধর্মান্ধ হয় না, আবার নাস্তিকও হয় না। (ঐ; পৃঃ ৪৪)

জার্মান সংস্কৃতির সান্নিধ্য

ঢাকা-কলকাতা-করাচির পর লন্ডন-প্যারিস-টোকিও। প্রথম তিনটিতে অবস্থান এবং শেষোক্ত তিনটি বড় শহরে ভ্রমণসূত্রে লব্ধ অভিজ্ঞতা, পৃথিবীর বহু মানুষের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ের স্মৃতি নিয়ে কবি সৈয়দ আলী আহসান ১৯৫৮ সালে এলেন জার্মানির ফ্রাংফোর্ট। আন্তর্জাতিক লেখক সমিতি পিইএন-এর সপ্তাহব্যাপী বার্ষিক সম্মেলন। আগের বছর টোকিওতে একই উপলক্ষে তাঁর সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিল ইতালীর কথাশিল্পী আল্‌বের্তো মোরাভিয়ার। এবার লন্ডন থেকে ফ্রাংফোর্টের পথে তিনি তাঁর সফর সঙ্গী। দুজনেই হতাশ হলেন বিমান বন্দরে। টোকিওর মতো সম্বর্ধনা তো নেই-ই, এমনকি হোটেলে নিতেও কেউ আসেনি। তবে জানা গেল যে, এয়ারপোর্ট বাসে চড়ে তাঁদের জন্য নির্ধারিত হোটেল ফ্রাংফোর্ট হফ-এ যাওয়া যাবে। আরও একটু পর জানতে পারলেন যে, হোটেলটি খুবই প্রাচীন ও বিখ্যাত এবং সেখানে অন্যান্যদের মধ্যে সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে উঠেছেন স্বয়ং জার্মানির প্রেসিডেন্ট ড. হয়েস এবং ভারতের রাষ্ট্রপতি ড. রাধাকৃষ্ণন।

ফ্রাংফোর্ট সম্পর্কে তাঁর বর্ণনা :

> ফ্র্যাংকফোর্ট শহরটি একটি উদ্যান নগরী। শুধু ফ্র্যাংকফোর্ট কেন জার্মানির অধিকাংশ নগরীই তাই। প্রতিটি শহরে বৃক্ষের প্রাচুর্য এবং অপরূপ বৃক্ষের শোভায় শহরগুলো সৌন্দর্যমন্ডিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানির অনেক শহর ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। কিন্তু ধ্বংসকে অতিক্রম করে জার্মানির শহরগুলো আবার নতুন শোভায় জেগে উঠেছে। ফ্র্যাংকফোর্ট শহরটি একেবারেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। বিধ্বংসের একটি নিদর্শনস্বরূপ একটি পুরাতন গির্জার অবশেষটুকু রেখে দেয়া হয়েছে। শহরের এক প্রান্তে একটি বাগান রয়েছে। বাগানের ভেতর দিয়ে চলবার পথ আছে, মাঝে মাঝে বসবার জায়গা রয়েছে। রাত্রিবেলা এই বৃক্ষাঞ্চলটি বিদ্যুতের আলোয় আলোকিত রাখা হয়। অবশ্য

আলোকসজ্জাটি এমন যাতে ছায়াচ্ছন্নতা একটি শোভার মত বিদ্যমান থাকে। ...

(*আমার জীবনে রমণী – মুগ্ধতার স্মৃতি*; পৃঃ ৮৫-৮৬)

ফ্র্যাংকফোর্ট ছাড়াও সেবার তিনি ডুসেলডর্ফ, বুডিংগেন, গ্লেনহার, নুরেমবার্গ, মিউনিখ, হাইডেলবার্গ, টুবিংগেন এবং হ্যানয় প্রভৃতি শহর দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন :

'এ শহরগুলোতে অবস্থানকালে আমি যাদুঘর দেখেছি, আর্ট গ্যালারি দেখেছি। একটি শহরে একটি নাটকও উপভোগ করেছি। জার্মানির এই অভিজ্ঞতা আমার জীবনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। অনেক পরে আমি প্রাচীন ও মধ্যযুগের জার্মান সাহিত্য এবং আধুনিক জার্মান সাহিত্যের দুটি নিদর্শন বাঙ্গালী পাঠকদের কাছে উপস্থিত করতে সক্ষম হয়েছি। আমার *একক সন্ধ্যায় বসন্ত* কাব্যগ্রন্থের মধ্যে এ সময়কালে জার্মানি ভ্রমণের অভিজ্ঞতার কিছু চিহ্ন আছে। "আমার পূর্ব বাংলা" কবিতায় আমি লিখেছিলাম :

"উত্তর ব্যাভোরিয়ার অরণ্যের বিস্তারে
বাতাস সূর্য্যের আলো আর
প্রতিটি শহর যেন সবুজ
এবং শিথিল বিশ্রামের মতো
তারা আমাকে আচ্ছন্ন করেছিলো।"

একক সন্ধ্যায় বসন্ত কাব্যগ্রন্থের আরও দুটি কবিতায় এ সময়কার সৌভাগ্য এবং আনন্দের কিছু পরিচয় আছে। কবিতা দুটির একটি হচ্ছে "তোমার হৃদয় আমার হৃদয়" এবং অন্যটি হচ্ছে "তোমাকে দিলাম"। "তোমার হৃদয় আমার হৃদয়" কবিতাটির একটি চরণ হচ্ছে – 'পাইনের বনে, ঘাসের গন্ধ অল্প আকাশ দেখা'। মানুষের জীবনের একটি সামগ্রিক সত্তা আছে, সে যা কিছু করুক এবং যেখানেই করুক সবকিছু পুঞ্জিভূত হয়ে তার বোধকে নির্মাণ করে। জীবনের কিছু অংশ বাদ দিয়ে আর কিছু অংশকে বিবেচনায় এনে জীবনের চেতনা নির্মাণ করা যায়না। জীবন হচ্ছে সামগ্রিক চৈতন্যবোধ। আমার বিদেশ জীবনের অভিজ্ঞতাকে আমি তাই কখনও আমার জীবন থেকে বাদ দিতে পারিনা। (ঐ; পৃঃ ৯৪-৯৫)

এরপর ১৯৬০ সালের জুনের ষোল থেকে বাইশ তারিখ পর্যন্ত পশ্চিম বার্লিনে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বুদ্ধিজীবী সম্মেলনে তিনি যোগ দেন। পৃথিবীর অন্যান্য দেশ থেকে যাঁরা এ সম্মেলনে যোগদানের জন্য এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন – সেনেগালের লেওপোল্দ সেদার সঁগর, ঘানার ড. কুফী বুসিয়া, ইটালীর বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ইগনাৎসিও সীলোনে, ইংল্যান্ডের স্যার হারবার্ট রীড, স্টীফেন স্পেন্ডার, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ড. জর্জ ওপেনহাইমার, এডওয়ার্ড শীলস, জর্জ কেনন, ভারত থেকে জয়প্রকাশ নারায়ন, মীনু মাসানী, অশোক মেহতা প্রমুখ। বার্লিন থেকে অধ্যাপক আহসান হ্যাঙ্গেরিয়ান রাইটার্স ইন একসাইল নামক দেশত্যাগী হাঙ্গেরীয় লেখকদের সম্মেলনে যোগ দেবার জন্য ডুসেলডর্ফে যান। স্পেনের বিখ্যাত লেখক-দার্শনিক ডন সালভাদার মাদারিয়াগা সম্মেলনটির উদ্বোধন করেন।

এক পর্যায়ে তিনি পূর্ব বার্লিন যান। সেখানে কয়েকজন কমিউনিষ্ট লেখকের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। এদের মধ্যে একজন কবি ও কথাশিল্পীর নাম পাচ্ছি – গটহোল্ড গ্লোগার। তাঁর বোন রোজভিটা অতিথি-অভ্যর্থনাকারিণীরূপে এবং উত্তরকালে ঘনিষ্ঠজনরূপে এক বিশেষ ভূমিকায় অবতীর্ণ। অধ্যাপক আহসান বহুকাল পরে এ সম্পর্কে লিখেছেন যে, সংক্ষিপ্ত হলেও জার্মানীর শহরে বন্দরে ব্যাপক ভ্রমণ, সেখানকার নানাশ্রেণীর মানুষের সঙ্গে ভাববিনিময় তাঁর মন ও মননে উপযুক্ত ছাপ রেখেছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। (দ্রঃ *আমার জীবনে* ...পৃঃ ৮৪-৯৯)।

১৯৭৪ সালে তিনি শেষবারের মত জার্মানি সফরে যান জার্মান সরকারের আমন্ত্রণে। আবার ফ্র্যাংকফোর্ট, হাইডেলবার্গ, মিউনিখ, টুবিংগেন, স্টুটগার্ট, বার্লিন, হামবুর্গ প্রভৃতি শহর, বিশেষ করে সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পরিদর্শন করেন। স্মরণযোগ্য যে, সে সময়ে তিনি ছিলেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। পরবর্তীকালে প্রধানত ঢাকাস্থ জার্মান দূতাবাসে কর্মরত কয়েকজন রাষ্ট্রদূত, গ্যাটে ইনস্টিটিউটের পরিচালকবৃন্দ ছাড়া আমাদের জানা মতে দুজন প্রখ্যাত জার্মান সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাত হয়েছিলো। একজন হলেন গুনটার গ্রাস আর অন্যজন আনমারী শিমেল।

সত্তরের দশক থেকে বিশ্বসাহিত্যে গুনটার গ্রাস (১৯২৭) জার্মান প্রতিবাদী লেখক হিসেবে পরিচিত। তুলনামূলকভাবে তাঁর লেখা আলী আহসান সাহেব সম্ভবত কমই পড়েছিলেন। আমার ধারণা, তিনি গ্রাস-এর *দা টিন ড্রাম* এবং *লোক্যাল এনেসথেটিক* নামক উপন্যাস দুটিই বিশেষভাবে

পড়েছিলেন। প্রথমটি সম্পর্কে তিনি একবার আমাকে কিছু বলেছিলেন আর শেষোক্ত বইটি আমি বিদেশ থেকে তাঁর জন্য নিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু আসলে তিনি গ্রাসের বই আরো কয়েকটি পড়ে ফেলেছিলেন। একটি লেখায় তিনি গুনটার গ্রাস যে তাঁর 'একটি উপন্যাসে সভ্যতার বিবর্তন দেখিয়েছেন যুগ যুগ ধরে মানুষের খাদ্য স্বভাবের মধ্যে দিয়ে' তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন। তাঁর মতে, 'গ্রাসও এক ধরনের অস্তিত্ববাদী। কিন্তু তাঁর অস্তিত্ববাদ সার্ত্রের অস্তিত্ববাদের সমার্থক নয়। তিনি সাধারণ মানুষের এবং যন্ত্রণাক্লিষ্ট নিম্নবিত্তদের কথা চিন্তা করতে ভালবাসেন।' (*কথাচিত্র : বিশ্বসাহিত্য;* পৃঃ ১৭১-১৭২)।

গুনটার গ্রাস একবার ঢাকা এসে সৈয়দ আলী আহসানের সাক্ষাৎপ্রয়াসী হন। একটি চমৎকার সান্ধ্য অনুষ্ঠানে তাঁরা মিলিত হলেন অধ্যাপকের কলাবাগানের বাসভবনে। তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা নাসরীনের রান্না করা প্রধানত মৎস্যনির্ভর নৈশভোজ উপভোগ করেন গুনটার গ্রাস ও তাঁর স্ত্রী। পূর্বাহ্নে সাবেক রাষ্ট্রপতি আবু সাঈদ চৌধুরীসহ তাঁরা তিনজন মানবিক ও রাজনৈতিক কিছু জটিল সমস্যা নিয়ে আলোচনায় মত্ত হন। ছোট্ট দুটি রচনায় অধ্যাপক আহসান তা লিপিবদ্ধ করেছেন। (ঐ; পৃঃ ১৬৭-১৬৯ এবং ১৭০-১৭৩)। তবে বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য কিছুকথা এখানে উদ্ধৃত করা প্রয়োজন :

> দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে জার্মানিতে যে অশুভ শক্তি জেগে উঠেছিল সেই অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে গুনটার গ্রাস প্রতিবাদী হয়ে উঠেছিলেন। হিটলার সামগ্রিকভাবে জার্মানির বিশ্বাস এবং সত্যকে ভুলুণ্ঠিত করেছিলেন। ক্ষমতার দর্প ছিল হিটলারের প্রচন্ড। এই দর্পে দর্পিত হয়ে তিনি ভাষাকে ব্যবহার করেছিলেন মানুষের স্বাধীন চিন্তাকে নিরুদ্ধ করবার জন্য। তাই হিটলারের পতনের পর জার্মানির পুনর্জাগরণের সমস্যা যখন দেখা দিল তখন প্রশ্ন জাগলো যে প্রত্যয়কে চিহ্নিত করবার জন্য কোন শব্দ মানুষ ব্যবহার করবে? লেখকরা চিন্তা করতে লাগলেন যে, যুদ্ধকালে নানারকম অকল্যাণ আদেশের জন্য যেসব শব্দ ব্যবহার হয়েছে সেসব শব্দকে পরিহার করতে হবে। অতীতের ধ্রুপদী যুগের সাহিত্য থেকে বিশ্বস্ত শব্দ সন্ধান করতে হবে এবং লোকজীবন থেকে বিশ্বস্ত শব্দ সন্ধান করতে হবে। বর্তমান সময়ের জন্য প্রত্যয় নির্মাণ করতে হলে শব্দকে একটি সাহসী অঙ্গীকারের প্রতীক হতে হবে। (ঐ; পৃঃ ১৬৭)।

ফ্রাউ আনমারী শিমেল একবার ঢাকায় এসে অধ্যাপক আহসানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এই মহিলা জার্মানির বন ছাড়াও আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন। তিনি হলেন ইসলামী সংস্কৃতিসমৃদ্ধ অনেকগুলো দেশের ভাষা-সাহিত্য ও ধর্মতত্ত্বের বিশেষজ্ঞ। তাঁদের আলোচনার বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায়নি। তবে সুফী সাধনার প্রতি উভয়ের আকর্ষণের কথা বহুজনবিদিত।

অধ্যাপক আহসান ১৯৫৮ সাল থেকে আমৃত্যু আলোচনা প্রসঙ্গে প্রায়ই জার্মানির কথা বলতেন। জার্মান সংস্কৃতির প্রতি তাঁর সশ্রদ্ধ মনোভাব নানাভাবে প্রকাশ পেত। উদ্ধৃত রচনা ক'টি ছাড়া জার্মান সাহিত্যের ওপর তাঁর প্রায় – অজানা দুটি বই আছে। বই দুটো তাঁর রচিত নয়, তবে অংশিকভাবে অনূদিত ও পূর্ণভাবে সংশোধিত ও সম্পাদিত। ইউরোপীয় ভাষা সমুহের মধ্যে ইংরেজি ছাড়া ফরাশি ও জার্মান ভাষার প্রাথমিক জ্ঞান তাঁর ছিল। দুটো বই-ই একই বছরে অল্প দিনের ব্যবধানে প্রকাশিত এবং আকৃতিতে বেশ বড়। প্রথম বইটির নামপত্রে পাওয়া যাবে : *জার্মান সাহিত্য/একটি নির্দশনী / মধ্যযুগ থেকে আধুনিক সময় পর্যন্ত /* ভূমিকা ও সম্পাদনায় : সৈয়দ আলী আহসান / বইঘর চট্টগ্রাম। এতে একটি অতিরিক্ত তথ্য রয়েছে ইংরেজিতে : Bengali Translation of Classical Reading from German Literature. গ্রন্থটি উলফগ্যাঙ ল্যাঙ্গেনবুকার কর্তৃক সংকলিত এবং হ্যারো হিলসিঙ্গার কর্তৃক সম্পাদিত। বাংলা অনুবাদ : সৈয়দ আলী আহসান কর্তৃক সম্পাদিত। বাংলা অনুবাদকের নাম নেই। সম্পাদকের ভূমিকা রয়েছে ১৩ পৃষ্ঠার। প্রথম প্রকাশ; জুলাই, ১৯৭৬। প্রচ্ছদ সৈয়দ লুৎফুল হক। পৃষ্ঠা ৫৬৪।

দ্বিতীয় বইটি হল : *আধুনিক জার্মান সাহিত্য* (পিইএন সংকলন) সম্পাদনা ও কবিতাংশের অনুবাদ : সৈয়দ আলী আহসান। লালন প্রকাশনী Co-Production of Horst Erdmann Verlag / সেপ্টেম্বর, ১৯৭৬ / প্রচ্ছদপট : কাজী হাসান হাবিব, পৃষ্ঠা ৩৪৬। এতে সৈয়দ আলী আহসানের ভূমিকা (পৃঃ ৫-১০) এবং তাঁর অনূদিত ২৪টি কবিতা আছে (১৬৩-২০)। আধুনিক জার্মান সাহিত্যের কবিতা অংশে তিনি অনুবাদের বদলে তিনটি নতুন শব্দ ব্যবহার করেছেন : 'বাংলায় শব্দ বিন্যাস'। এই গ্রন্থ থেকে এখানে দুটি পুরো কবিতা উদ্ধৃত করা হল :

কি করে রুটি সেঁকা হয়
আর মদ চোলাই হয়
তা যখন দেখে সেরেছি
কি করে বোমা ফাটে
তাও যখন অনেকবার দেখেছি
তাহলে এগুলো নতুন করে দেখবার
আর আগ্রহ নেই
(ভাগ্যের কথা যে
আর বোমা ফাটছে না)
দেখেছি কি করে
রুটি মদ এবং ইত্যাদি
দেখেছি
কি করে বোমা কি করে
কি ভাগ্য যে দেখেছিলাম

আবার নতুন করে দেখবার আগে
সব ঔৎসুক্যই শেষ হয়েছে
দেখার আগে
(তখন; হ্যান্‌স পিটার কেলার; পৃঃ ২০৪-২০৫)।

***

পরিপক্ক ফল আমাকে আস্বাদন করালো
সমুদ্র আমাকে পান করালো
আমার শরীর ধারালো ছুরিকে
কাটালো এবং রাত্রির শ্রবণ
চুপি চুপি আমার সঙ্গে কথা বললো
আমি ঘুমোলাম তার গহ্বরে ...
আমার চোখ আমার দিকে তাকালো
দীর্ঘকাল এবং গভীর।
(আমার চোখ, হান্‌স সাহল; পৃঃ ২০৬)।

অধ্যাপক আহসানের জীবৎকালে প্রকাশিত শতাধিক গ্রন্থের অন্যতম *কথাচিত্র : বিশ্বসাহিত্য*। "মুখবন্ধ" এবং "আমার গ্রন্থপাঠের ভূমিকা" ছাড়াও এতে ৫৮টি প্রবন্ধ রয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন ভাষার লেখক ও তাঁদের সৃষ্ট সাহিত্য সম্পর্কে। জার্মান লেখক গুনটার গ্রাসের ওপর লেখা দুটির কথা

আমরা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছি। এ ছাড়া অন্য দুজন জার্মান ভাষার ঔপন্যাসিক এবং নাট্যকার সম্পর্কেও তিনি অল্পবিস্তর মন্তব্য করেছেন তাঁর অধ্যয়নের সূত্র ধরে।

১৯৭২ সালে সাহিত্যে নোবেল-বিজয়ী হেনরিখ ব্যোল (১৯১৭)-এর যুদ্ধের পটভূমিতে রচিত কয়েকটি উপন্যাসের পরিচিতিদান উপলক্ষে তিনি সামগ্রিক জার্মান মন-মানসিকতাকে উপলব্ধি করবার প্রয়াস পান। তিনি বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছেন :

> বাচনভঙ্গির পরিবর্তন এবং 'ডকুমেন্টারির পদ্ধতিতে ঘটনাবলীর বিবরণ এবং সমীক্ষা, একই সঙ্গে বিভিন্ন শব্দের অনুরণন, আবার নাৎসী প্রশাসকদের প্রাণহীন নিষ্ঠুর শব্দবৃত্তির সঙ্গে কল্পনার মায়াময় নির্মিত ...। সাধারণ জীবনের নানাবিধ গুনাবলী ইচ্ছার দায়ভাগ, অকৃতার্থতার বেদনা এবং প্রাত্যহিকতার বিভিন্ন অনুস্মৃতি। ... যুদ্ধে ধ্বংসযজ্ঞে লোকালয় চিহ্নিত হচ্ছে, সর্বত্র ত্রাস এবং সংশয়, অসম্ভব আবর্জনার মধ্যে একটি ক্লান্ত মানুষ খাবার সন্ধান করছে। এরকম দৃশ্য অনেক আছে। দৃশ্যগুলো এসেছে বর্ণনাসূত্রে।
> (*কথাচিত্র : বিশ্বসাহিত্য;* পৃঃ ১৫-১৬)

যুদ্ধ নিয়েই ব্যোল তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসের প্রকৃতি এবং গতিবিধি নির্মাণ করেছেন। ১৯৪৯ সালে তিনি তাঁর প্রথম উপন্যাস প্রকাশ করেন *দ্যা ট্রেইন ওয়াজ অন টাইম*। এ উপন্যাস দিয়ে যাত্রা শুরু করে ক্রমান্বয়ে শিল্পগত প্রবৃদ্ধি এবং অসাধারণ দক্ষতার কারণে হেনরিখ ব্যোল বর্তমানে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক। (ঐ; পৃঃ ১৬)

দ্যা ট্রেইন ওয়াজ অন টাইম উপন্যাসের নায়কের চিন্তার সূত্র ধরে ব্যোল বলছেন,

> কখনও এরকম হয় যে সহজভাবে উচ্চারিত জেনেও শব্দ অকস্মাৎ রহস্যঘন তাৎপর্যে পূর্ণ হয়। উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যতের অপরিজ্ঞাত ক্ষেত্রে ছুটে গিয়ে একটি নিরুদ্ধ কথাকে উন্মুক্ত করে এবং বুমেরাং-এর মতো একটি চরমতম নিশ্চয়তায় তার কাছেই ফিরে আসে, যে শব্দটি সে উচ্চারণ করেছিলো। অবিবেচিত শব্দ বক্তার কাছে ফিরে নিষ্ঠুর ভাগ্যের অকুশলকে প্রতিষ্ঠা করে।' (ঐ; পৃঃ ১৬-১৭)

অধ্যাপক আহসান লক্ষ্য করেছেন যে,

> ধ্বংসের ক্রোড়পত্রে হতাশার প্রেক্ষাপট, যান্ত্রিক কর্মসাধনায় সে সমস্ত মানুষ চলাফেরা করছে তাদের মধ্যে ব্যোল একান্ত মানবিক উপলক্ষ সন্ধান করেছেন। (ঐ; পৃঃ ১৭)

ব্যোলের *সেসব দিনের রুজি* শীর্ষক উপন্যাস সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন, 'শুধু কয়েকটি ফ্লাশব্যাকের সাহায্যে এবং নায়কের স্মৃতি উদ্ঘাটনের সাহায্যে জার্মানির সাধারণ মানুষের অসহায়তা চিত্রিত করেছেন। এ অসহায়তা এমন যে শেষ পর্যন্ত প্রেমেও এর নিবৃত্তি নেই। ... একটি ঠান্ডা এবং অনিবৃত্ত ক্ষুধার চিত্র এই গ্রন্থে অংকিত হয়েছে। খাবারের গন্ধ চতুর্দিকে পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু খাবার নেই। চতুর্দিকে আবর্জনা, ধ্বংস এবং অসম্ভব হতাশা। কিন্তু মানুষের চিত্তে মমতা আছে, প্রণয়ের ইচ্ছে আছে। কিন্তু অবসর নেই, সুযোগ নেই।'। (ঐ; পৃঃ ১৮)

পিটার হ্যান্ডকে (১৯৪২) নামক জার্মান ভাষায় এক জীবনবাদী লেখক সম্পর্কে অধ্যাপক আহসানের মন্তব্য :

> তিনি পৃথিবীর মানুষকে বিভিন্ন কর্মের মধ্যে, ভাষার মধ্যে এবং সমাজের বিভিন্ন ন্যায়-অন্যায়ের মধ্যে এবং নানাবিধ ইচ্ছা-অনিচ্ছার মধ্যে প্রত্যক্ষ করতে চান। এভাবে প্রত্যক্ষিকরণের জন্য তিনি নাট্য কৌশলকে তাঁর মাধ্যম হিসাবে বেছে নিয়েছেন। (ঐ; পৃঃ ২২) 'আত্ম-সমালোচনা' নামক একটি নাটকে হ্যান্ডকে মানুষের জীবনের ক্রমপরিবর্তনকে চিহ্নিত করেছেন। নাম পরিচয়হীন নারী-পুরুষের দুটি কণ্ঠস্বর কেবল অভিযোগ করে যাচ্ছে। জন্ম থেকে মানুষের ক্রমান্বয়ে যে পরিবর্তন সে পরিবর্তনের বিষয়ে অভিযোগ। কণ্ঠস্বর দুটি বিচ্ছিন্নভাবে উচ্চারণ করে, আবার একত্রিত হয়ে সমস্বরে উচ্চারণ করে। কখনও আনন্দে উচ্চারণ করে, কখনও হিংসায়, কখনও ক্ষুব্ধতায়, কখনও বেদনায়। অল্প সময়ে অভিনীত এই নাটকটি মানব জীবনের আলেখ্য। (ঐ; পৃঃ ২০)

হ্যান্ডকের নাটকের মূলতত্ত্ব ব্যাখ্যা করে অধ্যাপক আহসান মন্তব্য করেন :

> মানুষ বক্তব্য প্রকাশের জন্য ভাষাকে নির্বাচন করে সেই ভাষার সাহায্যে পৃথিবীকে অস্বাভাবিকভাবে চিনতে শেখে। অর্থাৎ বস্তুর

নিজস্ব সত্তায় বস্তুকে না চিনে একটি নির্দেশিত অহমিকায় বস্তুকে সে নির্বাচন করে। একটি ক্ষয়িষ্ণু সমাজ-ব্যবস্থায় ভাষার অপব্যবহারের মাধ্যমে জীবনের একটি ভ্রান্ত ছবি প্রদর্শনের চেষ্টা চলে। পৃথিবীর মানুষ এভাবেই যথার্থ সত্য থেকে বঞ্চিত হয়। (ঐ; পৃঃ ২১)

পরিশেষে এটা নিশ্চিতভাবে লক্ষ্য করা গেছে যে, যাপিত জীবনে সৈয়দ আহসান কখনো যথার্থ সত্য থেকে বঞ্চিত হতে চাননি। তাই স্বধর্মে অটুট থেকে, নিজস্ব সংস্কৃতির ব্যাপক অনুশীলনকে আপন কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দু স্বরূপ বিবেচনায় রেখেও তিনি বারবার বিদেশী সংস্কৃতির সৌরভ-লাভে তৎপর হয়েছেন, প্রয়োজনে তাকে আত্মস্থ করেছেন।

তুর্কি-আরবী ঐতিহ্যের নৈকট্য

জীবনের শিলান্যাস গ্রন্থে সৈয়দ আলী আহসান লিখেছেন, 'আমার কাব্যকর্মের সূত্রপাতে ইকবালের প্রভাব কিছুটা এসেছিল কিন্তু সম্পূর্ণ নয়। কিছুটা এই অর্থে যে, ইকবাল যে অর্থে ইসলামের মূল প্রজ্ঞায় প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রত্যেক মুসলমানকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমিও আমার চল্লিশ দশকের কয়েকটি কবিতায় ইসলামের প্রথম যুগের সৌরভের কাছে আত্মসমর্পনের কথা বলেছিলাম' (পৃঃ ৫৪-৫৫)। আমরা এখানে দুটি প্রত্যয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখব, এক, ইসলামের মূল প্রজ্ঞায় প্রত্যাবর্তন, দুই, ইসলামের প্রথম যুগের সৌরভের কাছে আত্মসমর্পন। বস্তুত, এদিক-ওদিক চঞ্চল অভিক্রমের পর সৈয়দ আলী আহসান তাঁর ব্যক্তিগত ও বুদ্ধিবৃত্তিগত জীবনে একাধিকবার যৌবনারম্ভে যে প্রত্যয়ের প্রতি প্রতীতি প্রকাশ করেছিলেন তা নানাভাবে বাস্তবায়িত করতে সচেষ্টও কম ছিলেন না। তিনি আরও লিখেছেন 'আরবী ভাষা ও লিপির প্রতি আমার শ্রদ্ধা জানাতে শিখেছিলাম ছোটবেলা থেকেই কিন্তু তাই বলে মাতৃভাষাকে অবহেলা করিনি। বস্তুত আরবীর সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভাষা বাংলার প্রতি আমরা সমভাবে শ্রদ্ধাশীল ছিলাম'।
(ঐ; পৃঃ ৫৭-৫৮)

এই একই গ্রন্থ থেকে আরেকটি কথা এখানে উদ্ধৃতিযোগ্য মনে করছি। ১৯৫৬ সালে প্রথমবার ইউরোপে গেলে ফরাশি কবি ক্লের গলকে কবি মুসলিম বিশ্বাসের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করছেন :

> এক কথায় বলতে গেলে বলতে হয় পরিচ্ছন্নতা। কর্মে সাধনায়, চিন্তায় ও বিশ্বাসে, মানবিক সম্পর্কে বিশুদ্ধ হওয়া।
> (ঐ; পৃঃ ২০৮)

উপর্যুক্ত প্রারম্ভিক সূত্র ধরে আমরা অধ্যাপক আহসানের সঙ্গে তুর্কী-আরব ঐতিহ্যের নৈকট্যর দিকে দৃষ্টিপাত করব। ঐতিহ্যগতভাবে ইতিহাসের এক অলিখিত অধ্যায়ে ইরাক থেকে এই পরিবারের সুবা বাংলায় আগমনের সময় থেকে বিচ্ছুরিত হয়েছে ওই দুটি এলাকার যুগ্মসংস্কৃতি।

১৯৫৮ সালে অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান ব্যাপকভাবে মধ্যপ্রাচ্য সফর করেন। (ঐ পৃঃ ২৩৮)। অবশ্য তিনি প্রথমে যান ইরানে এবং সেখানে তিনি প্রখ্যাত ইরানী সাহিত্যিক জয়নুল আবেদীন রাহনুমার সান্নিধ্য লাভ করেন। জয়নুলের মহানবী চরিত্র *পয়গম্বর* তাঁকে প্রভাবিত করে এবং চল্লিশ বছর পর তিনি স্বয়ং *মহানবী* গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর ইন্তেকালের কিছু আগে এই গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হলে তিনি অপার আনন্দ লাভ করেন। এই সুন্দর অনুবাদকর্মটি সম্পাদন করেছেন অস্ট্রেলিয়া নিবাসী এক সময়ের করাচী প্রবাসী বাঙালি জনাব মোহাম্মদ আলমগীর। গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে কুয়ালালামপুর থেকে। অবশ্য অনুবাদক স্বয়ং ঢাকা থেকেও একটি সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন সৌজন্য বিতরণের উদ্দেশ্যে।

যাহোক, সেবার তেহরান থেকে বৈরুত এসে তিনি তিনজন প্রখ্যাত আরব বুদ্ধিজীবী এবং অধ্যাপকের সাহচর্য ও বন্ধুত্ব লাভ করেন। এঁরা হলেন – ডক্টর নিকোলা জিয়াদে, ডক্টর নবীহ আমিন ফারিস ও ডক্টর জোরায়েক। এঁরা সকলেই মেরোনাইট খ্রীস্টান। ড. জোরায়েকের *নাহনুওয়া তারিক* ইতিহাসে আরব সত্তা সম্পর্কে একটি বিখ্যাত গ্রন্থ। তিনি তাঁর গ্রন্থে আরব জাতির অতীত এবং বর্তমান নিয়ে আলাচনা করেছেন এবং এই জাতির সংস্কৃতির প্রধান প্রধান তাৎপর্য উন্মোচনের প্রয়াস পেয়েছেন (ঐ পৃঃ ২৩৯)। লেবাননবাসীর আরবীয়তায় গর্ব সম্পর্কে ধারণা করেন এবং আরব জাতীয়তার উন্মেষ পর্ব অবলোকনের সুযোগ তাঁর ঘটে। লেবাননের খাদ্যাভ্যাসের বৈশিষ্ট্যও তাঁকে উপযুক্তভাবে আকৃষ্ট করে। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সেখানকার ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে যে সম্প্রীতি বা পারস্পারিক আদান-প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে তাও তাঁর সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

বৈরুত থেকে বাগদাদ ছিল তাঁর সেবারের গন্তব্য। বোধগম্য কারণে বাগদাদের প্রতি ছিল তাঁর বিশেষ আকর্ষণ। তাঁর পূর্বপুরুষ শাহ আলী বোগদাদী এসেছিলেন সেখান থেকে। কিন্তু ভ্রমণকালে এক অনুন্নত ইরাক দর্শনে তিনি খুব সন্তুষ্ট হতে পারেননি। আসলে বাগদাদে তাঁর কোন বন্ধুজন তখন ছিল না এবং সেটি ছিল একটি অতি সাধারণ একদিন একরাতের স্টপ-ওভার তথা সাময়িক অবস্থান। বাগদাদ থেকে তিনি যান তুরস্কে। যান পরপর ইস্তাম্বুল ও আংকারা পরিদর্শন করেন। ইস্তাম্বুল বিশ্বদ্যিালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক ড. সাবরি উলগেনারের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের সূত্রপাত ঘটে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় তাঁর। প্রখ্যাত প্রবীণা জননেত্রী ও বুদ্ধিজীবী খালেদা এদিব হানুমের সঙ্গে তাঁর টেলিফোন সাক্ষাৎকার ঘটে। কিন্তু সেটিও খুব ফলপ্রসূ হয়নি, কেননা মাদাম খালেদা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা (১৯৪৭) বিষয়টিকে খুশী মনে গ্রহণ করতে পারেননি।

এ সময়কার একটি কবিতায় তিনি লিখেছিলেন, 'ইতিহাস কালো হয়ে দেয়ালের গায়ে গায়ে ছবি – (নোনা ধরা ক্ষয়ে যাওয়া চারিদিকে নিষেধ নিঃশেষ)'। ইস্তাম্বুল সেবার তাঁকে খুব আকর্ষণ করতে পারেনি। কিন্তু আংকারায় গিয়ে তিনি স্বস্তি লাভ করেছিলেন। অন্য একটি কবিতার মধ্যবর্তী অংশ উদ্ধৃতি করা যায় :

"ইস্তাম্বুল থেকে আংকারায় নেমেই
ঝড় আর বৃষ্টি –
উপবাসী বন্ধুর ভূমি থেকে নামলাম
সকালের স্নিগ্ধতায় –
আংকারা যেন বাংলাদেশের বৈশাখ-অপরাহ্ণ
হৃদয়ের তল থেকে বৃষ্টি এসেছে,
আনন্দ ও কৃতজ্ঞতায় যেন উচ্ছসিত হয়েছে –
রাজপথে বৃষ্টি নেমেছে আর আমার হৃদয় ভিজেছে।
পাথরের নুড়ি, ধূলোবালি আর জীর্ণতায়
ইস্তাম্বুল প্রতিদিনই যেন ইতিহাস হতে চেয়েছে –
তকসিম স্কোয়ার বা নদীর ওপর বেহজিদে
যদিবা নিঃশ্বাস নিতে চেয়েছি
হোটেল থেকে নেমে নিম্নগামী বিস্তীর্ণ পথ বেয়ে
অগ্রসর হতে পারেনি।
আংকারায় পৃথিবীর উদার বিস্তারে
হৃদয় আশ্বস্ত হলো।'

('আংকারায় বৃষ্টি', সৈয়দ আলী আহসানের *শ্রেষ্ঠ কবিতা*, শিকড়, ২০০২, পৃষ্ঠা ৮৭-৮৮)।

তুরস্কের খাদ্য সম্ভার তাঁর খুবই ভালো লেগেছে। তিনি জানেন যে, সেদেশের রন্ধন প্রণালী পৃথিবীর বহু দেশকে প্রভাবিত করেছে। বিভিন্ন ধরনের কাবাব এবং বিরিয়ানী পৃথিবীতে তুরস্কেরই দান। ইউরোপের যে সমস্ত দেশ তুরস্কের অধিকারে ছিল সে সমস্ত দেশ তো বটেই, তাছাড়া

রাশিয়াতেও তুরস্কের খাবার প্রচলিত হয়েছে (*জীবনের শিলান্যাস*, বার্ড, ২০০২, পৃঃ ২৪১)।

একই ভ্রমণ সূত্রে তিনি মিসরে যান। কায়রোর পুরাকীর্তিসমূহ দর্শনেই তিনি কালক্ষেপণ করেন। তবে তাঁর অভিজ্ঞতার ফসল বাংলা কবিতায় স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। দুই বাঙালি, দুই বুদ্ধিজীবী স্বামী-স্ত্রীর সঙ্গ তিনি পেয়েছিলেন সেখানে। তাঁরা হলেন – মুহাম্মদ হোসেন ও বেগম জামাল হোসেন।

সেবার করাচী ফিরে তিনি একটি আন্তর্জাতিক সেমিনারের নেতৃত্বদান করেন। সেমিনারের বিষয়বস্তু ছিল : **Islam in the Modern World** । তাঁর ভাষায় ওটা ছিল – Fresh attempt in our part ... to trip an intellectual encounter between Western and Eastern viwpoints on Islam ।

সেমিনারে অংশগ্রহণের জন্য এসেছিলেন নাবিহ আমীন ফারিস, নিকোলা জিয়াদে, সাবরি উলগেনার প্রমুখ তিন আরব-তুর্কী এবং ড. শাফাক নামক ইরানী বুদ্ধিজীবী। তাছাড়া পাশ্চাত্য জগতের বেশ ক'জন বিশিষ্ট ইসলাম বিশেষজ্ঞ অংশগ্রহণ করেছিলেন সে আলোচনা সভায়।

১৯৬২-র শেষদিকে ঢাকায় ফিরে তিনি যখন বাংলা একাডেমীতে কর্মরত, তখন মওলানা আব্দুর রহমান বেখুদের সহযোগিতায় *কোরান শরীফ আমপারা* অংশ বাংলা অনুবাদ করেন। এই অনুবাদ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না হলেও *বাংলা একাডেমী পত্রিকার* ১৩৬৯ সালের কার্তিক-পৌষ সংখ্যায় ছাপা হয়। অনুবাদের কিছু নমুনা নিম্নরূপ :

পরম করুণাময় আল্লাহর নামে।
আমরা কি তোমার জন্য তোমার হৃদয়কে পূর্ণ বিকশিত করি নাই?
এবং তোমার গুরুভার অপসারণ করি নাই?
যাহা তোমার পৃষ্ঠদেশকে ভারাক্রান্ত করিয়াছে?
এবং আমরা কি তোমার নাম গৌরবান্বিত করি নাই?
সংকট এবং স্বাচ্ছন্দ্য একই সূত্রে গাঁথা
নিশ্চয়ই সংকটের সঙ্গেই স্বাচ্ছন্দ্য।
অতএব যখনই অবসর পাও তখনই আপনাকে নিয়োজিত কর এবং তোমার প্রভুর অনুরক্ত হও।'

(উদ্ধৃত : *সৈয়দ আলী আহসান সংবর্ধনা গ্রন্থ* ১৯৮৫, পৃঃ ৫২-৫৩)।

১৯৬৩ সালের ৩০ অক্টোবর বাংলা একাডেমীর তৎকালীন প্রধান নির্বাহী প্যারিস-লন্ডন ঘুরে আবার বৈরুতে যান। পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং আরবী সংস্কৃতির আরেকটু ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভের সুযোগ তাঁর ঘটে।

১৯৮৭ সালের ৬ মার্চ তিনি একটি সেমিনারে অংশগ্রহণের জন্য মিসরে গমন করেন। দুর্ভাগ্যবশত ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতি বিষয়ক এই সেমিনার সম্পর্কে তিনি বিশেষ কিছু লেখেননি। কিন্তু মিসর ও সৌদি আরবের অনেক বৈশিষ্ট্য নিয়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন। ১৯৫৬ ও ৭০-এর পর এই তৃতীয়বার এবং শেষবার তিনি কায়রো এলেন এবং কায়রো শহরের বিস্তৃতি লক্ষ্য করেছেন। তিনি অপার আনন্দ অনুভব করেছেন, কেননা তাঁর মতে, 'ইতিহাসের প্রেক্ষাপট কোথাও মুছে যায়নি। প্রাচীনকালে মিসরে শিল্পগত আনন্দের প্রকাশ ছিল, মিসরীয়রা যা কিছু স্পর্শ করেছিল তাকেই সুন্দর করে প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছিল। তারা গ্রীকদের মতো সুচারু সমতায় কোন কিছু করেনি। তারা বিপুল এবং বলিষ্ঠ ব্যঞ্জনায় সব কিছুকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছে। শিল্প সমালোচকেরা একে বলেছেন রিগাল মনুমেন্টালিটি। বর্তমান মিসরীয় সরকারও মিসরের এই প্রাচীন চরিত্রকে ধরে রাখার চেষ্টা করেছে। মিসর যেমন একটি প্রাচীন সভ্যতার রহস্য নিকেতন, তেমনি ইসলামী সভ্যতারও একটি আশ্চর্য সমৃদ্ধমান ক্ষেত্র।'

(উদ্ধৃতিগুলো তাঁর *হে প্রভু আমি উপস্থিত* পুস্তিকা থেকে। এতে কোন পৃষ্ঠা সংখ্যা দেয়া হয়নি। সৃজন প্রকাশনী লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৮)।

কনফারেন্স শেষে তিনি গিয়েছিলেন নতুন গড়ে ওঠা শহর ইসমাইলিয়ায়। সেখানে দেখলেন 'বাড়িঘর নতুন ধরনের। কায়রোর সঙ্গে একেবারেই মিলে না। আধুনিক বসবাসযোগী গৃহ স্থানীয় আবহাওয়ার সঙ্গে সঙ্গতি লক্ষ্য করে গড়ে উঠেছে।'

সৈয়দ সাহেবের মতে, 'কায়রো হচ্ছে আরবী সংস্কৃতির সর্বশেষ কেন্দ্র। *কোরআন শরীফের* পঠনের নানাবিধ রীতি মিসরীয়রাই প্রবর্তন করেছে। আরব দেশসমূহের মধ্যে মিসরই একমাত্র দেশ যেখানে *কোরআন শরীফের* ভাষা সম্মানিত মর্যাদায় প্রতিদিনের ব্যবহার্য জীবনের মধ্যে উচ্চারিত হয়। ভাষার ক্ষেত্রে আল আজহারের একটি মৌন শাসন রয়েছে যা সকলেই মান্য করে। বর্তমানে আল আজহার পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন শিক্ষায়তন এবং আল আজহারের মসজিদটি একটি দর্শণীয় স্থাপত্যশিল্প।'

অধ্যাপক আহসান আমাদের জানান যে, তাঁর দাদা উচ্চ শিক্ষার জন্য মিসরে গিয়েছিলেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বর্তমান প্রবন্ধকারের দাদাও তাঁর যৌবনে দীর্ঘদিন মিসরসহ বিভিন্ন আরব দেশে কাটিয়েছিলেন। তিনি আরও লিখেছেন, 'ধর্ম বিষয়ক জটিল কোন সিদ্ধান্তের জন্য আমরা আল আহজারের কাছে যেতাম। আল আজহারের প্রতিপত্তি যুগে যুগে আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। আমাদেরই সঙ্গে শুধু আল আজাহারের সংযোগ নষ্ট হয়েছে।'

তিনি কায়রোর ইসলামী শিল্পকলা জাদুঘরের কথা উল্লেখ করে লিখেছেন যে, 'প্রভূত উপকরণ থাকলেও জাদুঘরটি যথাযোগ্যভাবে প্রদর্শিত হয় না এবং ঐতিহাসিক ক্রম অনুসারে বস্তুগুলো সাজানো হয়নি। অর্থাৎ জাদুঘরটি জাতীয় জাদুঘরের মতো মর্যাদায় গুরুত্বসহকারে সরকারী ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভুক্ত হয়নি। সৈয়দ আলী আহসান কায়রো হোটেলে ইহরাম বেঁধে তাঁর জেদ্দা আগমনকে একটি প্রাচীন সমৃদ্ধমান ইতিহাসের প্রেক্ষাপট থেকে ইসলামের প্রাচীনতম কেন্দ্রে প্রবেশের অধিকার লাভ রূপে গণ্য করেছেন।

বিলম্বিত অথচ অনিবার্য ইসলামের প্রাচীনতম কেন্দ্র অভিমুখে সৈয়দ আলী আহসানের অভিযাত্রা তাঁর নিজের জন্য যেমন তেমনি আমাদের অনুভূতি ও বুদ্ধিবৃত্তির ইতিহাসে চিহ্নিত হওয়ার মত ঘটনা। জেদ্দা, মক্কা ও মদিনায় তাঁর সংক্ষিপ্ত সপ্তাহখানেকের সফর। আগেভাগে ওমরাহ পালনের দৃঢ় অভিপ্রায় প্রকাশ করে তিনি মিসর সফরে রাজি হয়েছিলেন। হজ বা ওমরাহ পালন যে কখনো তিনি করতে পারবেন তাতে তিনি ছিলেন সন্দিহান। কেননা, শারীরিক অসুস্থতা হয়তো প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে।' কিন্তু পরম করুণাময়ের অনুগ্রহে তিনি সম্পূর্ণ সুস্থাবস্থায় এই বাধা অতিক্রম করতে পেরেছিলেন। প্রাচীনতম ইতিহাস ও লোককাহিনীর দৃষ্টান্তে আরব ভূখন্ডের দুই সম্মানিত স্থান মক্কা ও মদিনা সম্পর্কে অনেক মূল্যবান বক্তব্য তিনি উপস্থাপন করেছেন। বস্তুত, ১৯৪০-এর দিকে তিনি আরবদের লোককাহিনীভিত্তিক তথ্য ব্যবহার করে 'মক্কা মোয়াজ্জামার পথে' নামে একটি কবিতা লিখেছিলেন। কবিতাটিতে তিনি হযরত সোলায়মান ও রানী সেবার কাহিনী বলেছিলেন। বলেছিলেন আসাদ কামিলের কথা। আসাদ কামিল মদিনা শহর ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন। সেখানে কবিতা বর্ণনা পরম্পরার প্রয়োজনে মক্কা নগরীর কথাও বলেছিলেন।

সৈয়দ আলী আহসানের মনে হয়েছে মক্কা একটি রহস্যময়ী নগরী। পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ যুগ যুগ ধরে এই নগরীতে প্রবেশ করবার

আকাঙ্খা করেছে এবং প্রবেশ করে স্বস্তি লাভ করেছে। আরব ভূখণ্ডে বহুনগর স্থাপত্য শিল্পে অতীতে সমৃদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু সেই অর্থে মক্কা নগরী কখনো সমৃদ্ধশালী ছিল না। যে স্থানে মক্কা অবস্থিত এক সময় সে অঞ্চল ছিল শুষ্ক আর উষর। এ পথ দিয়ে যাত্রীবাহী উটের কাফেলা চলাচল করতো এবং আন্তঃদেশীয় বাণিজ্যের ক্যারাভানও মক্কা শহরের কাছ দিয়ে যেত। কিন্তু এসমস্ত কিছু মক্কাকে সমৃদ্ধ করেনি। মক্কা সমৃদ্ধ এবং সম্মানিত হয়েছিল পৃথিবীর প্রাচীনতম গৃহের জন্য, যে গৃহকে আমরা কাবাগৃহ বলে থাকি। মক্কা নগরী হচ্ছে পৃথিবীর অন্যান্য নগরীর মাতৃসমান। পৃথিবীর সকল বিশ্ববাসীর কাছে এই নগরীর ঐশ্বর্য হচ্ছে অলৌকিক ঐশ্বর্য, আত্মার ঐশ্বর্য এবং এমন এক ঐশ্বর্য যা মানব আত্মাকে উদ্বুদ্ধ এবং অলংকৃত করে।'

ছোট বই *হে প্রভু আমি উপস্থিত* যেন আদ্যেপান্ত উদ্বৃতিযোগ্য। প্রত্যেকটি বিষয়ে অধ্যাপক আহসান মৌলিক দৃষ্টিকোণ থেকে তার অপূর্ব ভাষাশৈলী আরোপ করে এক একটি বিষয়ে প্রাঞ্জল বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। আরব ভূমিতে স্থাপত্যের দিকটি বিশেষভাবে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তিনি লিখেছেন, 'স্থাপত্যের কৌশলের দিক থেকে কাবাগৃহ নির্মল, নিশ্চিন্ত, পরিচ্ছন্ন এবং অফুরন্ত বিনয় ও প্রেমের উৎস। এই বিনয় এবং প্রেমের সমর্থনে কাবাগৃহ মর্যাদাবান এবং ইসলামী উম্মাহর সকল প্রেরণার কেন্দ্রভূমি।'

নিজের অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন, 'আমি হারেম শরীফের ভেতরে প্রবেশ করে কেমন একপ্রকার তন্ময়তা অনুভব করলাম। মনে হল বিশ্বের সমস্ত সম্পদ পুঞ্জীভূত হয়েছে আর আমি সেই সম্পদকে স্পর্শ করতে যাচ্ছি। হারেম শরীফের চত্বরের মধ্যে অগণিত মানুষ পড়ে চলেছে 'লাব্বায়েক, আল্লাহুমা লাব্বায়েক' - হে আল্লাহ আমি তোমার নিকটে উপস্থিত, আমি তোমার সান্নিধ্যে উপস্থিত। আমি তোমার আহবানে সাড়া দিতে এসেছি। তুমি এক ও অদ্বিতীয়, তোমার কোনো শরিক নেই। নিঃসন্দেহে সকল প্রশংসা তোমার এবং সমগ্র বিশ্বের একমাত্র আধিপত্য তোমার। হে প্রভু, তোমার দাসানুদাস তোমার নিকট উপস্থিত, তুমি তাকে গ্রহণ করো।' অধ্যাপক আহসান রাসুলে খোদার সঙ্গে জ্যোতির্ময়তার সম্পর্ক নিয়ে প্রচলিত কিংবন্তীর কথা উল্লেখ করে লেখেন, 'সত্যিই তো আলো-'। তাঁর মতে, এই জ্যোতির্ময়তাই ইসলামের মূল সত্য। আমরা কাবাগৃহে যাব এই জ্যোতিকে অনুভব করার জন্য।

'হারাম শরীফের আলোকিত বিপুল চত্বরের মাঝখানে পবিত্র কাবার অবস্থিতি গৃহটিকে একটি অলৌকিক আকর্ষণে মন্ডিত করেছে। হারাম শরীফের বিপুল চত্বরের উন্মুক্ততা কাবা গৃহটিকে এমনভাবে বেষ্টন করে রেখেছে যে, সহজেই এই উন্মুক্ত এলাকার সঙ্গে কাবাগৃহের স্থাপত্যগত একটি সম্পর্ক নির্ধারিত হয় বলে সহজেই ধারণা জাগে। কাবাগৃহের অভ্যন্তরভাগ উন্মুক্ত নয়। কিন্তু চতুর্দিকের উন্মুক্ততা এবং উর্ধাকাশের উন্মুক্ততা কাবাগৃহকে একটি বিপুল উন্মুক্ততায় অংশভাগী করেছে। এককভাবে গৃহটিকে কোন বিশেষ পার্থিব শিল্পকুশলতা বহন করে না, কিন্তু হারাম শরীফের বিপুল চত্বরের মাঝখানে গৃহটিকে একটি অলৌকিক অবস্থিতি বলে বিশ্বাস জন্মে।'

স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও তার উপকরণ নিয়ে তাঁর প্রজ্ঞাপূর্ণ নানা মন্তব্য রয়েছে। আমরা জানতে পারি 'মক্কা শরীফ এবং মদিনা শরীফের মসজিদগুলোর বৈশিষ্ট্য তাদের অসাধারণ সুন্দর মিনারের জন্য। তুরস্কের মসজিদের বৈশিষ্ট্য যেমন গম্বুজের জন্য, আরব দেশের মসজিদের বৈশিষ্ট্য সে ক্ষেত্রে মিনারের জন্য।'

তবে সবকিছুর ওপর 'মক্কা ও মদিনা' প্রত্যেক মুসলমানের ভালো লাগে একটি ভালোবাসার কারণে। আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের (সঃ) প্রতি ভালোবাসা এ দু'টি নগরীকে অনন্তের প্রতি আসক্তির কেন্দ্রভূমি করেছে। সব মিলিয়ে দেখা যাচ্ছে, অধ্যাপক আহসান তাঁর সৌদি আরব অবস্থানকে জীবনের জটিলতা থেকে মুক্ত একটি উদার সময়ের মধ্যে উপস্থিত হওয়া মনে করেছেন। অর্থাৎ এতে তাঁর যাপিত জীবনের সার্থকতা খুঁজে পেয়েছেন, 'আল্লাহর কাছে পূর্ণ নিবেদনের প্রত্যয়ে' তিনি যে কাবাগৃহ পরিক্রমণ শুরু করেছিলেন, তা যেন কোনোদিন শেষ হবে না। রাসুলে খোদার রওজা মোবারকের যে বর্ণনা তিনি দিয়েছেন তাও অতুলনীয় : 'তবে সকল অনুভূতি হয়তো শব্দে ব্যাখা করা যায়। কিন্তু মসজিদে নববীতে রওজা মোবারকের সামনে একজন বিশ্বাসীর চিত্তে যে অনুভূতি জাগে তাকে কোনো শব্দের ব্যাখায় মূর্ত করা যায় না।'

সৈয়দ আলী আহসান সৌদি আরবের বিচার ব্যবস্থার অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন। কেননা তিনি লক্ষ্য করেছেন যে, যেখানে 'আইনের শাসন প্রদত্ত এবং এ শাসন এড়ানোর ক্ষমতা কারোরই নেই। বিচার ব্যবস্থায় বৈষমীকরণের কোনো সুযোগ নেই। (তাছাড়া), সাক্ষ্য ব্যবস্থাটা আচরণের

একটি ট্র্যাডিশন বা এতিহ্য।' তার মতে, 'একটি দেশের জন্য সবচেয়ে বড় প্রয়োজন দেশের মানুষকে সংশয়মুক্ত এবং অকল্যাণ ও গ্লানি থেকে মুক্ত করা। সৌদি আরবে বিচার ব্যবস্থায় এই নীতি সর্বদা অনুসৃত হয়ে থাকে। মানুষে মানুষে মানবীয় সম্পর্কের যথার্থ বিকাশমানতার জন্য অন্যায়ের প্রতিরোধের প্রয়োজন এবং গ্লানিমুক্ত সমাজ ব্যবস্থার প্রয়োজন।

আরব সংস্কৃতির মাহাত্ম্য সম্পর্কে তাঁর ব্যাখ্যা যুক্তিপূর্ণ, একদিকে আরবরা যেমন পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানকে কুসংস্কারমুক্ত করেছে, তেমনি প্রতাপী আরবগণ অধিকৃত অঞ্চলের সংস্কৃতিকে বিলুপ্ত করেনি।

২৫ জুলাই ২০০২ সালে ইন্তেকালের কিছু পূর্বে দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরূপে তিনি আর একবার জেদ্দা গমন করেছিলেন। কিন্তু সে সম্পর্কে বা অন্য কোন আরব ব্যক্তিত্বের সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগের বিষয়ে কিছু লেখেননি।

প্রবন্ধ শুরুতে আমরা সৈয়দ সাহেবের প্রথম জীবনের দু'টি প্রত্যয়ের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলাম পাঠককে – ইসলামের মূল প্রজ্ঞায় প্রত্যাবর্তন এবং ইসলামের প্রথম যুগের সৌরভের কাছে আত্মসমর্পণ। জীবনের শেষ পর্যায় অবধি আমরা কি তাঁর যাপিত জীবনে সেই প্রত্যয়ই পরিপূরিত হতে দেখি না?

ইরান থেকে গ্রহণ

ইরানের সঙ্গে বাংলার সাংস্কৃতিক সম্পর্ক আজকের নয়, বহু আগের। জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান ও বাংলার মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা বহন করে চলেছেন ইরানী সংস্কৃতির ফল্গুধারা; ভিন্ন জীবনধারা পদ্ধতি, চালচলনবিধি, রন্ধন শিল্প, এমনকি দৈনন্দিন বহু কার্যকলাপ ও উচ্চারণেও এটি খুবই স্পষ্ট। সাহিত্যিক জীবনের শুরু থেকে সৈয়দ আলী আহসান ছিলেন এ ব্যাপারে সচেতন। পারস্য সাহিত্যে তাঁর পিতা-মাতার কিছু অধিকার ছিল। তাঁর মা ফারসি কবিতা পড়তেন, মুখস্ত আবৃত্তি করতেন যা বালক আহসান গভীর মনোযোগের সঙ্গে শুনতেন। এসব দৃশ্য বা ঘটনার কথা তিনি জীবনের শেষদিন অবধি স্মরণ করতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে সৈয়দ আলী আহসান ভর্তি হলেন ইংরেজি বিভাগে। কেননা, ইংরেজি ভাষার প্রতি যেমন তাঁর আগ্রহ ছিল তেমনি সাবেক বৃটিশ বাংলায় ইংরেজি সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানের প্রতিও তাঁর কিছুটা মোহ ছিল। কবিতার ক্ষেত্রে তাঁর পূর্বসূরিদের মতো তিনি আবিষ্কার করলেন টিএস এলিয়টকে। এলিয়ট ছিলেন প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর পর্বে আধুনিক কবিতার একজন প্রধান পুরুষ, আবার একই সঙ্গে ঐতিহ্য এবং অতীতের উত্তরাধিকারের প্রসঙ্গে এক বলিষ্ঠ প্রবক্তা। তরুণ আলী আহসান ছিলেন আইরিশ পুনরুজ্জীবনবাদীদের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট। তিনি এবং তাঁর সঙ্গে অনেক লেখক-বুদ্ধিজীবী দীর্ঘকাল ধরে তাঁদের অবহেলিত এবং বিস্মৃতপ্রায় অবস্থান থেকে ফারসি-আরব সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলকে পরিচর্যা করে গেছেন। এই প্রসঙ্গে আমরা তাঁর 'মহরম' শীর্ষক কবিতাটির কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করতে পারি। কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল *মাসিক মোহাম্মদী*'তে মাঘ ১৩৫০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে –

"আজ কাঁদে দেখ কুল মখলুক উড়াবে জীর্ণ ধূলি
বিভীষিকাময় রজনী এসেছে মৃত্যু দেশের রুদ্ধ দুয়ার খুলি
শঙ্কায় কাঁপে রুক্ষ প্রহরগুলি।

রব্বুল আলামিন
আজ প্রোজ্বল কর পৃথিবীর দ্বীন।
তোমার বান্দা এ মাটিতে এসে
রেখেছে ধূলায় নির্মম স্বাক্ষর –
দুনিয়ার বিষে জীর্ণ হয়েছে বুকের পঞ্জর।
মথিত বুকের রুদ্ধ বেদনা নাচিছে পরিত্রাণ
বাঁচাও পীড়িত মানবাত্মারে
হায় খোদা রহমান।"

লেখকদের আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান পিইএন এবং কংগ্রেস ফর কালচারেল ফ্রিডম সংস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার কারণে সৈয়দ আলী আহসান ৫০-এর দশকের মধ্যভাগ থেকে নব্বুইয়ের দশক পর্যন্ত বহুবার বিদেশ গমন করেছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ইরান পরিভ্রমণ করেন ১৯৫৮ সালে। সেখানে ইরানী পিইএন-এর প্রেসিডেন্ট তাঁকে সাদর সম্ভাষণ জানান এবং তিনি তাঁর বাড়িতেই অতিথিরূপে অবস্থান করেন। এ সময়ে তেহরান বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনকালে তিনি পরিচিত হন দর্শন বিভাগের অধ্যাপক ড. শাফাকের সঙ্গে। পরবর্তীকালে করাচীতে তাঁর আয়োজিত একটি সম্মেলনে তিনি ড. শাফাককে যোগদানের আমন্ত্রণ জানান। ইরানী অধ্যাপক করাচী আগমন করেন এবং জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দান করেন। পরবর্তীকালে ১৯৬৩ সালে প্রফেসর সৈয়দ আলী আহসান দ্বিতীয়বারের জন্যে ইরান যান। সঠিক তারিখটি জানা যায়নি। তবে খুব সম্ভব এটি ছিল বছরের শেষের দিকে। তেহরানে তিনি শিশু সাহিত্যের উপর আন্তর্জাতিক সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। বাংলা ভাষায় শিশুদের জন্য লেখা বইপত্র সম্পর্কে তিনি একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। সম্মেলন শেষে তিনি সনতি নামে একজন ইরানী বন্ধুর সঙ্গে মহানন্দে কাস্পিয়ান সমুদ্র সৈকতে একটি সপ্তাহ কাটান। ১৯৭০ সালে তেহরানে অনুষ্ঠিত গ্রন্থ উন্নয়নের উপর একটি ইউনেস্কো কর্ম শিবিরে উপদেষ্টারূপে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ পান। সে সময়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান। কিন্তু সরকারী কর্তৃপক্ষ তাঁকে দেশ ত্যাগের অনুমতি প্রদান করেননি। বিষয়টি তাঁকে খুব অসন্তুষ্ট করেছিল এবং জীবনের শেষদিকেও মাঝে মধ্যে এ কারণে তাঁকে দুঃখ প্রকাশ করতে দেখা যেত। '৭০-এর দশকের শেষদিকে তিনি খুব আগ্রহের সঙ্গে ইরানে ইসলামী বিপ্লবের বিজয়াভিযানের পর্যায়গুলো

অনুধাবন করেছিলেন। তাঁর ছাত্র এবং বন্ধুদের সঙ্গে এ বিষয়ে প্রায়ই আলোচনা করতেন।

'৮০-র দশকে ঢাকাস্থ ইরানী কালচারাল সেন্টার আয়োজিত বহু সেমিনার বা অনানুষ্ঠানিক আলোচনা সভায় তিনি অংশগ্রহণ করেন। এই সময়ে তিনি হযরত আলী (রাঃ) রচিত *নাহাজুল বালাগা* একটি চমৎকার অনুবাদ প্রকাশ করেন। তাছাড়া, এই নিবন্ধের লেখককে বাংলা সাহিত্যে হাফেজ শিরাজীর প্রভাব সম্পর্কে গবেষণা করতে উৎসাহ দেন। এই গবেষণার ফল প্রকাশিত হয়েছে *দৈনিক ইত্তেফাকে*'র একটি বড় প্রবন্ধে এবং *ইরানী কালচারেল সেন্টার নিউজ লেটারে* ইংরেজিতে প্রকাশিত অপেক্ষাকৃত ছোট রচনায়। ১৯৯০ সালে ঢাকায় একটি প্রথম বড় ধরনের ইরানীয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল এবং মহাকবি ফেরদৌসীর *শাহনামা* প্রকাশের সহস্রবর্ষপূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত সেমিনার-আলোচনা সভায় আমরা দু'জন অংশগ্রহণ করি। এটা এখন উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সে সময়ে বাংলা একাডেমীর মহপরিচালকরূপে ব্যয়বহুল *শাহনামা* প্রকাশের প্রকল্প গ্রহণে আমি তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলাম। প্রকল্পটি ঝুঁকিপূর্ণ এবং বিপদসঙ্কুল ছিল। কেননা, এর জন্য কোন বাজেট বরাদ্দ ছিল না। অথচ সহস্রবর্ষপূর্তি উপলক্ষে ইউনেস্কো প্রযোজিত বহু আন্তর্জাতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে এই প্রকাশনাটি অন্তর্ভুক্ত হওয়া অনিবার্য ছিল। তাছাড়া মূল কাজটির উদ্যোক্তাও ছিলেন তিনি। মধ্য-ষাটে অধ্যাপক আলী আহসান তাঁর বন্ধু কবি মনিরুদ্দিন ইউসুফকে এই বিশাল গ্রন্থের অনুবাদের দায়িত্ব প্রদান করেছিলেন। তখন তিনি নিজেই ছিলেন বাংলা একাডেমীর সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত। পরবর্তীকালে এর পাণ্ডুলিপি বছরের পর বছর একাডেমীর শেলফে পড়েছিলো এবং ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত এবং পাঠের অযোগ্য হয়ে পড়ছিলো। ঈষৎ ভাবাবেগে আক্রান্ত হলেও আজ আমি স্মরণ করতে পারি যে, ইরানে ইসলামী বিপ্লবের দশম বার্ষিকীর মহাআয়োজনে শরিক হবার জন্যে আমরা দু'জন আমন্ত্রিত হয়ে রওয়ানা দেবার জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলাম। এতে আরও অংশগ্রহণ করেছিলেন প্রফেসর মঈন উদ্দীন আহমদ খান, প্রফেসর শমশের আলী ও সাপ্তাহিক *বিক্রম* সম্পাদক মাসুদ মজুমদার। হঠাৎ অসুস্থতার কারণে শেষ মুহূর্তে অধ্যাপক আহসানকে যাত্রা বাতিল করতে হয়। তখন তেহরানে পৌঁছে আমাকে বহু ইরানী বন্ধুর কাছে তাঁর শরীর-

স্বাস্থ্য সম্পর্কে প্রশ্নের জবাব দিতে হয়েছিল। তাঁরা সবাই তাঁর জন্য গভীরভাবে সমবেদনা প্রকাশ করেছিলেন। তেহরান, ইস্পাহান এবং অন্যত্র অনুষ্ঠিত উৎসব ও আলোচনা সভাগুলোতে তাঁর অনুপস্থিতির কথা স্মরণ করেছেন অনেকে। ইরান ও তার সংস্কৃতির প্রতি তাঁর ছিল গভীর অনুরাগ। তাঁর বহু রচনায় এর প্রমাণ পাওয়া যাবে। আমরা একটু আগে সে সম্পর্কে উল্লেখ করেছি। ইরানীদের মধ্যেও ছিল তাঁর বেশকিছু বন্ধু ও অনুরাগী। এটা সর্বজ্ঞাত যে, তিনি ছিলেন মহান সুফী সাধক শাহ আলী বোগদাদীর প্রত্যক্ষ বংশধর। তাঁর নামের প্রথম দুটি শব্দ 'সৈয়দ' এবং 'আলী' যা মুসলিম উম্মার প্রতি সাধারণ আসক্তি রয়েছে এরকম অন্যান্য মানুষের কাছেও গভীর শ্রদ্ধা-মমতাভরা আবেদন সৃষ্টি করে। মহান আল্লাহ তাঁকে যা দেবার তাই যেন দেন : এই প্রার্থনা।

ইরানী দূতাবাসের সাংস্কৃতিক বেন্দ্রে অনুষ্ঠিত সৈয়দ আলী আহসান স্মরণ সভায় উপস্থাপিত ইংরেজি বক্তৃতার বাংলা অনুবাদ। ইংরেজি পাঠ "Syed Ali Ahsan and the Iranian Culture" প্রকাশিত হয়েছে The *Bangladesh Today,* Friday Special, December 27, 2002-এর সংখ্যায়।

ব্রাজিলের অভিজ্ঞতা

বিশ্বকাপ ফুটবলের বদৌলতে ব্রাজিল বাংলাদেশে একটি সুপরিচিত ভূখন্ড। এই পরিচিতি অবশ্য ফুটবল তারকাদের নাম ও পতাকার মধ্যেই বেশি সীমাবদ্ধ। ব্রাজিলের নৈসর্গিক সৌন্দর্য, সংস্কৃতিগত বৈচিত্র্য, আধুনিক মনস্কতার বিষয় নিয়ে এখানে খুব মাথা ঘামানো হয়না, যেমন হয় ইউরোপীয়দের মধ্যে, বিশেষ করে ফরাশি ও পর্তুগীজদের কাছে। এখানে আমরা অবশ্য একটা সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপস্থাপন করব অধ্যাপক আলী আহসানের ব্রাজিল পরিভ্রমণের প্রসঙ্গ নিয়ে।

এর ওপর তিনি লিখেছেন ১৯৮৬-র ২১শে ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত *প্রেম যেখানে সর্বস্ব* গ্রন্থের "রায়ো ডি জেনিরোতে" শীর্ষক একটি অধ্যায়ে (ঐ; পৃঃ ৮৬-৯৬)। অবশ্য বিভিন্ন সময়ে ব্রাজিলের অভিজ্ঞতা তাঁর কথকতার একটি প্রিয় বিষয় ছিলো।

১৯৬০ সালের এক অনুকূল পরিবেশে তিনি গিয়েছিলেন রায়ো ডি জেনিরো তে একটি আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলনে যোগ দিতে। তিনি তখন করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত। রায়োতে পৌছেই তিনি লক্ষ্য করেছেন,

> 'এ শহরে অজস্র পার্ক, বহু আকাশচুম্বি অট্টালিকা, মিউজিয়াম, থিয়েটার, মিউজিক হল এবং আর্ট গ্যালারী আছে। শুনেছি, ১৯০৯ সাল থেকে এ শহর আধুনিক সজ্জায় সজ্জিত হতে থাকে। ব্রাজিলিয়ানরা বলে থাকেন রায়ো ডি জেনিরো পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দর শহর *(প্রেম যেখানে সর্বস্ব; পৃঃ ৮৮)*।

তিনি আরো প্রত্যক্ষ করেছেন যে, সেখানে নতুন স্থাপত্যকর্ম প্রাচীনপন্থী অট্টালিকার পাশাপাশি হৃদ্যতার সঙ্গে স্থাপিত হয়েছে।' (ঐ; পৃঃ ৯১)। তাছাড়া কোপাকাবানার সমুদ্র সৈকত আর কোরকাভাদোর পর্বতশৃঙ্গ রয়েছে দেশীবিদেশী মানুষের বিনোদন ও ভ্রমণ-তৃষ্ণা মেটানোর জন্য।

লন্ডনের বাশিন্দা তাঁর বন্ধু ইভান জেলেনিক-এর প্ররোচনায় তিনি কোপাকাবানা সমুদ্র তীরে একটি হোটেলে দুটো দিন কাটিয়েছিলেন। সে এক অনুপম অভিজ্ঞতা। আটলান্টিকের তরঙ্গ-বিক্ষোভে তাঁকে গভীরভাবে প্রাণিত করেছিল। তিনি হোটেলে বসে লিখলেন, "যখন অনেক কথা বলা শেষ হল" শীর্ষক কবিতা যার ক'টি চরণ হল :

'সব কিছু ভিজে যায়,
সমস্ত কথার মধ্যে লবণের স্বাদ
অতল আগ্রহ নিয়ে
অশ্বারোহী সমুদ্র সৈনিক
আমার পায়ের কাছে
বর্শা ফেলে মৃত্যুর বিলাসে
শিহরিত তটপ্রান্তে
ঐক্যতানে আমারে জড়ালো।

(ঐ; পৃঃ ৯৬)

সৈয়দ আলী আহসান লক্ষ্য করেছেন যে, "ব্রাজিলের তরুণ তরুণীরা আনন্দকে অপরিহার্য করে স্বাধীনতাকে নির্মাণ করেছে যা পৃথিবীতে অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। (ঐ; পৃঃ ৮৫) প্রত্যক্ষদর্শীরূপে এবং গ্রন্থখানি এই অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন তিনি। আমরা বহু ইউরোপীয়দেরও দেখেছি অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করতে। অনেকগুলো ছায়াছবিতে এর প্রমাণ পাওয়া যাবে। আনন্দ ও বেদনাতো জীবনের এপিট-ওপিট। *Orfeo Negro* (অর্ফেও নেগ্রো) নামে মার্সেল কাম্যুর এক অসাধারণ ফরাশি সিনেমায় আমরা ব্রাজিলের কার্নিভালকে কেন্দ্র করে জীবনের গভীর তাৎপর্য উদ্ঘাটিত হতে দেখি। অধ্যাপক আহসানে মতে,

> ..... একটি চিত্রকর্মকে যেভাবে অনেক কৌশলে রঙ ও রেখায় সার্থক করতে হয় তেমনি প্রেমকেও দৃষ্টি গভীরতায় এবং বাহুর সঞ্চালনে মধুময় করতে হয়।'

তিনি ব্রাজিলের বিখ্যাত লেখক জর্জ আমাদো এবং মাকাসো ফে আসিস-এর লেখা থেকে দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করে দেখিয়েছেন প্রেমের নিশ্চিন্ততা ও আনন্দ কী অপূর্ব স্বাচ্ছন্দ্যে প্রকাশ পেয়েছে কিংবা সাধারণ নায়ক-নায়িকা কী অসাধারণভাবে 'প্রেমের একটি গুঞ্জনকে হৃদয়ে লালন' করছে : ... 'আমাদের কাছে এগুলো অর্থহীন মনে হলেও ব্রাজিলের জীবনধারায় এগুলো অর্থহীন নয়। তাদের বিবেচনায় প্রেম একটি সুকুমার বৃত্তি।' (ঐ; পৃঃ ৮৬)

তাছাড়া, সাধারণ জীবনযাত্রায় ব্রাজিলবাসীদের কৌতুকপ্রিয়তা অনিবার্যভাবে লক্ষ্যযোগ্য। নির্ভাবনাময় কালক্ষেপনেও ওরা তুলনাহীন। তবে সৈয়দ আলী আহসানের বিবেচনায়,

> সহজ উদাসীনতার ভঙ্গি দেখালেও শিল্পকর্মে ব্রাজিলের মানুষ উদাসীন নয়। তার নিদর্শন পাই রায়ো ডি জেনিরোর নতুন স্থাপত্যে শিল্পে এবং ব্রাসিলিয়া শহরের সামগ্রিক নগর বিন্যাসে। (ঐ; পৃঃ ৯০-৯১)

লসিও কষ্টা, ওস্কার নিমেয়ার ছাড়া প্রখ্যাত ফরাশি-সুইস স্থপতি ল্য করবুজিয়ে 'ফরম' এবং 'ফাংশনের' মধ্যে সমন্বয় সাধন করে আধুনিক স্থাপত্যের প্রবর্তন করেন বিশেষ করে ব্রাসিলিয়া নামক নতুন রাজধানী নির্মাণ-পরিকল্পনায়। সৈয়দ আলী আহসান লক্ষ্য করেছেন যে,

> এ শহরের খোলা মাঠ, উদ্যান, হ্রদ, পথঘাট সবকিছুই অট্টালিকার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে নির্মিত হয়েছে। এ শহরটি আধুনিক সমৃদ্ধি ও সৌভাগ্যের অভিব্যক্তি। (ঐ; পৃ, ৯১)

ব্রাজিলের সাহিত্য আরেক উপভোগ্য সাংস্কৃতিক নিদর্শন। উনিশ শতকে এর সূত্রপাত। ১৮৫২-৫৩ সালে প্রকাশিত মানুয়েল আন্তোনিওদে আলমিদা'র একটি উপন্যাসে রায়োর প্রকৃত চিত্র, বিশেষ করে পর্তুগীজদের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভের পূর্বে সেখানকার অবস্থা জানা যায়। দুজন লেখকের কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে। অধ্যাপক আহসান সাহিত্য সম্মেলনে দুজন প্রবীণ কবির সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন – একজন ভিনিসিয়াম দে মোরায়েস, অন্যজন কার্লোস দ্রামন্ত দে আন্ত্রে দে। বিদেশী প্রতিনিধিদের মধ্যে ছিলেন আলবের্তো মোরাভিয়া (ইতালী), স্টিফেন স্পেন্ডার (ইংল্যান্ড), ইভান জেলেনিক (চেক), রচি হিঙ্গুরানী (ভারত) ফ্র্যাংক ডোজী (অস্টেলিয়া) পল তাবোরি (হাঙ্গেরী), রনে তাবেরনিয়ের (ফ্রান্স) প্রমুখ। তাছাড়া বারবারা নাম্নী এক সুন্দরী মার্কিন যুবতীকে তাঁর গাইড হিসেবে দিয়েছিল সম্মেলন কর্তৃপক্ষ।

অধ্যাপক আলী আহসানের নাতিদীর্ঘ রচনায় (৮৫-৯৬ পৃঃ) ব্রাজিলের বহুমাত্রিক দিকের আরও কিছু পরিচিতি পাওয়া যাবে। তাঁর মতে, বহুবিধ বৈচিত্র্য নিয়ে এই বিপুল আয়তনের দেশটি একটি জমাটবাঁধা ভূমিগত স্ত ব্ধতা নিয়ে যুগযুগ ধরে দাঁড়িয়ে আছে। এ সমস্ত বৈচিত্র্য সত্ত্বে ও ব্রাজিল তার স্বভাবে এবং চরিত্রে একটি ব্যক্তি-সত্তা হিসাবে পৃথিবীর সামনে উপস্থিত। ইংরেজীতে যাকে বলে ইন্টিগ্রেশন অর্থাৎ সমন্বয়, ব্রাজিলে বিভিন্ন জাতির মধ্যে এ সমন্বয় যেভাবে হতে পেরেছে সম্ভবত পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে তা হয়নি।

মঙ্গোলয়েড জাতিভুক্ত আমেরিকার ইন্ডিয়ান, আফ্রিকার নিগ্রো আর ককেশীয় উইরোপীয় সব একাকার হয়ে গিয়েছে সামাজিক বন্ধনে, ধর্মে, সংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্মে এবং আনন্দের উচ্ছ্বলতায়।

এখানকার নিগ্রোরাও খুব সুন্দর। এখানকার সৌন্দর্যের ধারনাটি শরীরী ব্যঞ্জনা এবং দৃষ্টির অভিঘাতকে নিয়েই। শরীরের রঙ নিয়ে নয়। কে সাদা কে কালো অথবা কে বাদামী তা নিয়ে এখানে কোনো জিজ্ঞাসা নেই। একেবারেই নেই। ফিয়েস্টার সময় আনন্দের উন্মাদ তান্ডব ঘটে। তার মধ্যে সকল জাতি গোত্র এক হয়ে যায়। এখানকার মানুষ বিভিন্ন পেশায় যুক্ত হলেও সকল পেশার মধ্যে একটি আন্তরিক পরিচয়ের আদান-প্রদান আছে। ... প্রায় সকল ব্রাজিলীয়ান পর্তুগীজ ভাষায় কথা বলে। কিছু সংখ্যক জার্মান, পোলিশ এবং ইটালিয়ান যারা খুব দক্ষিণে থাকে এবং উত্তরের গভীর অরণ্যের মধ্যে যেসব আদিম অধিবাসীরা থাকে তাদের বাদ দিলে এ দেশে সকলেই পর্তুগীজ ভাষায় কথা বলে। বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে এদের উচ্চারণের মধ্যে কোনো আঞ্চলিক ব্যবধান নেই। .... এদের জাতিসত্তার ঐক্য নির্ধারণে আর একটি বিষয় গভীরভাবে কাজ করেছে তা হল এদের ধর্ম। ব্রাজিলে শতকরা ৯৫ ভাগ লোক ক্যাথলিক ধর্মে বিশ্বাসী। কিছু আফ্রিকান আছে যারা অন্য মতাদর্শ নিয়ে আছে আবার কিছু আরব মুসলমান আছে, এরা একেবারেই নগণ্য। এরা বড় বড় শহরে বাস করে। এক সময় ব্যবসার উদ্দেশে এসেছিলো। পরে এদেশেই থেকে গেছে। (ঐ; পৃঃ ৮৭-৮৮)।

খুবই স্বল্প সময়ের অবস্থান সত্ত্বেও বিশেষ বোধ ও বুদ্ধির প্রয়োগে, পর্যবেক্ষণের ক্ষিপ্রতার গুণে ব্রাজিলে সৈয়দ আলী আহসানের এটি এক সফল সফর। ব্রাজিলের বুদ্ধিজীবীরা ছাড়াও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসসম্পন্ন লেখক মোরাভিয়া, তাবেরনিয়ের ও জেলেনিকের সঙ্গ তাঁকে যে আরো উদ্দীপ্ত করেছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

ভালোমন্দ অনেকগুলো দিক নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন, মজার মজার কাহিনী এবং চুটকি উপস্থাপন করেছেন। কিন্তু দীর্ঘ অর্ধশতাব্দী পরে বাস্তবতার নিরিখে কতটুকু এখনো বহাল রয়েছে তা হয়তো বলা মুশকিল। আমরা শাশ্বত এবং উল্লেখযোগ্য কিছু এলাকা এখানে তুলে ধরলাম, ব্রাজিলের প্রতি আমাদের অত্যুগ্র আগ্রহ কিছুটা প্রশান্ত হতে পারে, এই বিবেচনায়।

আমেরিকা : অন্তরঙ্গ অবলোকন

সম্প্রতি সৈয়দ আলী আহসানের আকস্মিক তিরোধানের পর তাঁর প্রথম গ্রন্থ প্রকাশিত হলো *আমেরিকা : আমার কিছু কথা*। প্রকাশক বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিমিটেড-এর পক্ষে গত ১৫ই সেপ্টেম্বর জাতীয় অধ্যাপকের জন্য আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রকল্প আয়োজিত স্মরণ সভায় শিক্ষামন্ত্রী , সংস্কৃতিমন্ত্রী, শিক্ষা সচিব ও অন্যান্য কয়েকজন খ্যাতনামা পন্ডিত ও সাহিত্যিকদের বইটি সৌজন্য উপহারস্বরূপ প্রদত্ত হওয়ায় এর এক অনানুষ্ঠানিক প্রকাশনা উৎসব হয়ে গেল, বলা চলে।

এই সেদিন ২৫শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায়, কলকাতা সফরের সুযোগে, পিজি হাসপাতালে প্রায় মাসখানেক ধরে শয্যাশায়ী অন্নদা শংকর রায়কে বইটির একটি কপি দিলে তিনি অনেকক্ষণ প্রচ্ছদের দিকে তাকিয়ে রইলেন। পরে বাকরুদ্ধ অস্ফুট কণ্ঠে 'আহসান', 'আহসান' বললেন এবং বুকের ওপর আমার হাত চেপে ধরলেন। বলা প্রয়োজন, বইটির চমৎকার প্রচ্ছদ পরিকল্পনা আরিফুর রহমানের : প্রাজ্ঞ মনীষীর দৃষ্টি নিয়ে সৈয়দ আলী আহসানের মুখচ্ছবি আর পশ্চাদপটে রয়েছে স্ট্যাচু অব লিবার্টি। প্রখ্যাত লেখক অন্নদা শংকরের বয়স এখন ৯৯ এবং এই দুটি শব্দ ছাড়া তাঁর আর কোনো কথা আমি বুঝতে পেরেছি বলতে পারবো না। তবে নার্স বললেন, একটু সুস্থ থাকলে তিনি এখনো সকালে 'ডিক্টেশন' দেন এবং তাঁর একটি গদ্য রচনা ও একটি ছড়া আমাকে দেখালেন। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমীর সচিব সনৎ কুমার চট্টোপাধ্যায় আমাকে বলেছেন, অন্নদা শংকর আলী আহসান সাহেবের ইন্তেকালের খবর পেয়ে কিছু লিখছিলেন তবে শেষ করতে পেরেছেন কিনা তিনি বলতে পারলেন না। কলকাতা ত্যাগের পূর্বে *আমেরিকা : আমার কিছু কথা* বইটির একটি কপি আমি মেদিনীপুরের প্রখ্যাত সাহিত্যিক-জীবনীকার আযহারউদ্দিন খানের কাছেও ডাকযোগে পাঠিয়ে দিয়েছি।

যেহেতু তিনি নাই, তাই বইটি আমাকে বই হবার আগে অর্থাৎ 'ফাইনাল প্রুফ' পর্যায়ে মনোযোগ সহকারে পড়তে হয়েছে। অবশ্য, শেষ অবধি, কতটুকু বিশুদ্ধ প্রকাশ সম্ভব হয়েছে, তা জানি না। তবে লাভ হয়েছে বইটি সম্পর্কে আমার পূর্ব ধারণা বদলে গেছে।

আমার ধারণা ছিল, তিনি তো অনেক কিছু লিখে যাচ্ছেন, আর সকাল বেলার নির্দিষ্ট সময়ে না লিখে কিংবা না লিখিয়ে পারেনই না (অনেকেই জানেন না যে বছর দেড়েক আগে ডান হাত ও পা অচল হবার বহু আগে থেকে গদ্য রচনা তিনি 'অনু লেখক'কে দিয়ে সারতেন অর্থাৎ ডিক্টেশন' দিতেন। এবং বিগত ১৬ বছর ধরে একাজটি প্রধানত করছেন শামসুজ্জোহা বকুল। তিনি একটা পারিশ্রমিক অবশ্যই পেতেন। কিন্তু এই সুযোগে আমি আন্তরিকভাবে বকুলের ভূয়সী প্রশংসা করি। কেননা এই বইসহ সৈয়দ আলী আহসানের বিগত বছরগুলোর বেশিরভাগ বই প্রবন্ধ তাঁর হাতে তৈরি। অধ্যাপক সাহেব প্রথম কপিই কেবল সংশোধন করতেন। চূড়ান্ত কপি না দেখেই প্রায় নীচে স্বাক্ষর করে দিতেন। বলা বাহুল্য, তাতে কখনোবা কিছু ভুলভ্রান্তিও থেকে যেত। এ পর্যায়ে তিনি প্রায়ই ধৈর্যহীন ছেলে মানুষের মতো ব্যবহার করতেন। দু-চারটি ক্ষেত্রে আমি সময় পেলে তাঁর অনুমতি নিয়ে ভুল সারিয়ে দিলে আবার ভয়ানক খুশি হয়ে যেতেন।) সুতরাং মার্কিন মুলুকে যাওয়া-আসার যে অভিজ্ঞতা, তা পড়তে কতো ভালো লাগবে সে বিষয়ে আমার একটু সংশয় ছিল। কিন্তু তা যে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজের মর্যাদা পাবে তা আমি আদৌ ভাবতে পারিনি। প্রুফ দেখে আর এখন ছাপা বই *আমেরিকা : আমার কিছু কথা* পড়ে একে ২০০২ সালের একটি মূল্যবান প্রকাশনার মর্যাদা দিতে আমার বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই।

করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ ছেড়ে ঢাকায় বাংলা একাডেমীর দায়িত্ব গ্রহণের পর ১৯৬১ থেকে ১৯৯৭ সাল অবধি তিনি পাঁচবার মার্কিন মুলুক সফরে যান। এগুলো ছিলো সরকারী-বেসরকারী বিমিশ্র সফর। তাঁর বড় জামাই প্রকৌশলী আলী আশরাফ মাসুদ মিয়া মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ এবং তাজউদ্দিনের বিশেষ প্রিয়পাত্র হওয়া কারণে স্বাধীন বাংলাদেশে উপযুক্ত পদমর্যাদা পেলেন না। ঘোরতর অনীহা সত্ত্বেও কিশোরগঞ্জের ছেলে ভাতের বদলে একবেলা আটার রুটি খেতে বাধ্য হলেন। সুতরাং তিনি আমেরিকার

অভিবাসী হবেন এই সিদ্ধান্ত নিলেন ১৯৭৩ সালে। প্রথম সন্তান কন্যা নাজ কমর (জিনাত) ছিলেন প্রয়াত অধ্যাপকের প্রাণের ধন। পাকিস্তান আমলে জন্মগ্রহণ করা তাঁদের কন্যা ডালি ও পুত্র হিজল অধ্যাপকের সবিশেষ আদরের পৌত্রী-পৌত্র। এরপর প্রথম পুত্র সৈয়দ আলী কাযেম পর্যায়ক্রমে শিল্পকলা যাদুঘর ও পদ্মা প্রিন্টার্সের কর্মক্ষেত্র ছেড়ে দেশের অন্যান্য অনেকের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে, দুই পুত্রকে মানুষ করার মানসে আমেরিকায় অভিবাসী হবার সুযোগ উপেক্ষা করতে পারে না। সে তার আব্বুকে নিয়ে যায় তাদের সঙ্গে বসবাস করতে। ছ'মাস কাটানোর পর যদ্দুর জানি, শীতাধিক্য ও 'হোম সিকনেসে'র কারণে জাতীয় অধ্যাপক দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। বড় ছেলের দুই পুত্র আবীর ও শাহীর ছিল তাঁর প্রাণাপেক্ষা প্রিয়। তাদের কথা মনে পড়লেই তাঁর চোখে আসতো পানি। তাই তিনি আবারও যেতেন আমেরিকায় কিন্তু অসুস্থতার কারণে আর যেতে পারেননি।

যাহোক, সব মিলিয়ে বছর দেড়েকের কিছু কম সময় তিনি মার্কিন মুলুকে অবস্থান করেছেন। কখনো এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত ঘুরে বেড়িয়েছেন। বহুজনের সঙ্গে মিশেছেন। মার্কিন সাহিত্য বাংলাদেশে তাঁর সমতুল আর কেউ পড়েছে কিনা আমি জানি না, তবে ওয়ালকেট, রবার্ট ফ্রস্ট, হেনরি জেমস, মার্ক টোয়েন. ড্রেইজার, ফকনার, হেমিংওয়ে, নরম্যান মেইলার, হেনরি মিলার, হাওয়ার্ড ফাস্ট, সল বেলো, টনি মরিসনসহ বহু খ্যাত-অখ্যাত লেখকের রচনা তিনি প্রবল আগ্রহে পাঠ করেছেন। মার্কিন সাহিত্যের একটি বড় সংগ্রহ তাঁর আছে। তাঁর বহু বন্ধুর মধ্যে আইভান ক্যাট্‌সের কথা বলা যায়। তিনি ফজলে রাব্বি এবং আমারও শ্রদ্ধাভাজন বন্ধু। প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী এডওয়ার্ড শীলসের কথা উল্লেখ করা যায় – তিনি ৬ মাস শিকাগো এবং ৬ মাস অক্সফোর্ডে কাটাতেন – শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিস্টিংগুইসড সার্ভিস প্রফেসর, শাহেদ সোহরাওয়ার্দী ও সুধীন দত্তের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ১৯৮৪ ও ১৯৯১ সালে তাঁর সঙ্গে আমার দুবার সাক্ষাৎ হয়। শেষবার জিজ্ঞেস করেন :

"How old is Ali Ahsan now" (আলী আহসান সাহেবের বয়স কত হলো?)

"Must be above seventy" (সত্তরোর্ধ তো হবেনই) – আমার ত্বরিৎ জবাব;

Oh, the boy of yesterday! (ও! গত কালের বালক!) – এই বইতে দেখছি তিনি লিখেছেন :

> শীলস আমাকে জানেন, হাসি মুখে কথা বলেন এবং আমার পিট চাপড়ে বলেন, "তুমি এখনও যুবক আছ।" তাঁর সঙ্গে সময় কাটানো একটি অভিজ্ঞতার মত। (প্রসঙ্গত)

তুলনাহীন বৈচিত্র্য আর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি বিশাল আমেরিকার কতটুকু আর তিনি তুলে ধরবেন? কিন্তু যা ধরেছেন তা এমন যে অন্তত বাংলায় অন্য কেউ তা ধরতে পারেননি, ধরা সম্ভবও ছিল না। তাঁর প্রসঙ্গ-কথা ছাড়াও বইটিতে রয়েছে ১৪টি রচনা : নিউইয়র্কের চিঠি, আমেরিকায় বইয়ের ব্যবসা, আমেরিকার জ্যাজ সঙ্গীত ইসলামের প্রভাব, কাউবয় পোয়েট্রি : আমেরিকার নতুন প্রকরণের কবিতা, কালো কবিতা : প্রেক্ষিত আমেরিকা, উইলিয়াম বারোজ : তাঁর জীবন-যন্ত্রণা, বাংলাদেশী ক্যাব চালক : প্রেক্ষিত আমেরিকা, আমেরিকার সুপার হিরো : ব্যাটম্যান, বিশ্বাসের প্রত্যাবর্তন : প্রসঙ্গ আমেরিকা, আমেরিকায় বয়স্করা, কনরাড হিলটন : একজন সফল ব্যবসায়ী, আমেরিকায় আমরা, নিউইয়র্কে বাংলাদেশীরা এবং আমেরিকা রোজনামচা। এছাড়া আছে বুক সোসাইটির সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার মুনাওয়ার আহমেদের সুচিন্তিত "প্রকাশকের কথা"। তিনি যথার্থই লিখেছেন :

> সাধারণ মানুষ দেখে চোখ দিয়ে, আর জ্ঞানী ব্যক্তিরা দেখেন এবং উপলব্ধি করেন অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে! তাঁদের এই দেখার মাঝে ফাঁক বা অপূর্ণতা নেই।

একদিকে সৌন্দর্য, অন্যদিকে কদর্যতায় ভরা মার্কিনী জীবনের মুখোমুখি বাংলাদেশের অভিবাসীরা যেসব সমস্যায় জর্জরিত হয়ে পড়ে পর্যটক সৈয়দ আলী আহসান তা মর্মে মর্মে অনুভব করেছেন, তাই তিনি তাঁদের জন্য একটি বাণী রেখেছেন :

> আমি আমেরিকাবাসী বাংলাদেশীদেরকে স্বপ্ন দেখতে বলি এবং কার্যকর করতে বলি। যেহেতু তাঁরা ভাগ্যান্বেষণে আমেরিকায় এসেছেন। সুতরাং, কোন একটি ক্ষুদ্র অবস্থায় তাঁরা নিঃশেষিত হোক, এটা আমি চাই না। স্বপ্নকে সফল করতে হলে আগ্রহ এবং বলিষ্ঠ প্রচেষ্টা প্রয়োজন। (ঐ; পৃঃ ৮১)

বিদেশে তিনি লক্ষ্য করেছেন যে,

> ... বাংলাদেশের মানুষ অনেকে অর্থহীন রাজনৈতিক বিভাজন নিয়ে অপরিসীম ক্ষুব্ধতার মধ্যে বাস করেন। রাজনীতিতে বিচার-বুদ্ধি থাকার প্রয়োজন। অন্ধ আনুগত্য গণতন্ত্রের জন্য বিপজ্জনক। আমি দেখলাম, রাজনীতির ভেদবুদ্ধি নিয়ে একদলের একজন সমর্থক অন্যদলের সমর্থকদের সঙ্গে পারস্পরিক বিবাদে লিপ্ত হচ্ছে। আনুগত্যের একটি শোভনতা থাকে। এঁদের মধ্যে তা নেই। সমালোচনা সহ্য করেন না। এঁদের কাছে দেশ নেই, দেশের কর্তব্য নেই। এক একজন মানুষ এক একটি রাজনৈতিক দলের তাত্ত্বিক সেজে প্রলাপে লিপ্ত হন। (ঐ; পৃঃ ১০২)

তুলনায় অন্যান্য দেশ থেকে আগত অভিবাসীরা, বিশেষ করে ভারতীয়রা তাঁদের নিজের দেশের সংস্কৃতি তুলে ধরার ক্ষেত্রে কিংবা অন্যভাবে তাঁদের দেশের স্বার্থরক্ষার ক্ষেত্রে যেভাবে আগ্রহী ভূমিকা পালন করেন, তিনি তার ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং বাংলাদেশীদের তার থেকে শিক্ষা করতে বলেন।

যিনি যে অবস্থায় থাকুন না কেন, বাংলাদেশের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য আমরা কিছু করি – এটি ছিল জাতীয় অধ্যাপকের মনের কথা। শুধু গুণে নয়, বিদেশকে আমাদেরও যে অনেক দরকার আছে সেক্ষেত্রে আমাদের সচেতন হতে হবে, একথা তিনি অনেকবার অনেকভাবে বলেছেন। এভাবে কিছুটা জিজ্ঞাসা এবং সমালোচনাসহ সৈয়দ আলী আহসান, তাঁর অন্তরঙ্গ অবলোকন তুলে ধরেছেন এই গ্রন্থে। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের মতো এটিও বিশিষ্টতামন্ডিত, বিশেষভাবে তাঁর অকুণ্ঠ স্বদেশপ্রেমের সঙ্গে বিদেশী নিঃসর্গের চিত্রকল্প উপভোগ এক অনবদ্য অভিজ্ঞতায় পর্যবসিত হয়ে যায়।

"এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে ..."

"সময় হারিয়ে যায়, সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে, কিন্তু চিত্তপ্রকোষ্ঠের রেখাঙ্কণ কেন জানি কোনো দিন মুছে যাবে না।"

– যখন কলকাতায় ছিলাম (পৃঃ ৩৮)

বিগত শতকের বিশের দশক থেকে পূর্ববাংলার শিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত যুবসম্প্রদায় স্বীয় গন্ডির বাইরে যাওয়ার প্রবল তাগিদ যে অনুভব করছিল, তার বহু প্রমাণ বিদ্যমান। 'মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত' – প্রবচন সঠিক কি না জানি না তবে বেশির ভাগ তরুণেরই গন্তব্য ছিল কলকাতা, আরেকটু বেশি বয়সের বা অধিক পুঁজির অধিকারীদের পুরী-কাশী-মথুরা, দিল্লি-আগ্রা-আজমীর; সুদর্শন যুবক কিংবা সঙ্গীতানুরাগীর লক্ষ্য থাকত বোম্বাই (অধুনা মুম্বাই), চিত্রজগতের কারণে। গন্ডির বাইরে বলতে আমরা এখানে ব্রিটিশ-ভারতের সীমানা চৌহদ্দির ভেতরের কথাই আপাতত স্মরণ করব।

আকৈশোর লালিত স্বপ্ন চরিতার্থ করার লক্ষ্যে সৈয়দ আলী আহসান গেলেন কলকাতা, পরে কিছু সময় থাকলেন হুগলি, পরিণত বয়সে গেলেন দিল্লি ও অন্যত্র। মুক্তিযুদ্ধের সুবাদে আরো কয়েকটি অতিরিক্ত শহর যেমন – নাগপুর, ব্যাঙ্গালোর, চেন্নাই প্রভৃতি এর সাথে যোগ করা যায়। পরবর্তীকালে একটি শিল্পী-সাহিত্যিক প্রতিনিধিদলের দলপতিরূপে আরো কিছু অঞ্চল যথা – শান্তিনিকেতন, আজমীর ও কাশ্মীর প্রথম বা দ্বিতীয়বারের মতো পরিদর্শনের সুযোগ তাঁর ঘটেছে। অবশেষে জীবনের শেষ প্রান্তে এসে দু-দু'বার তিনি গিয়েছেন কলকাতায়। বক্ষ্যমাণ সংক্ষিপ্ত আলোচনায় আমরা এসব সফরের পরিপ্রেক্ষিতে তার চিত্তগত প্রতিক্রিয়া, বুদ্ধিবৃত্তিগত অগ্রগতি কতটুকু তা অনুধাবনের প্রয়াস পাবো।

কলকাতার মোহ

'যখন কলকাতায় ছিলাম (আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ২০০৪) স্মৃতিকথায় সৈয়দ আলী আহসান লিখেছেন :

১৯৪০ সাল থেকেই কলকাতার সাথে আমার যথার্থ মৈত্রী। স্কুলে থাকতে এবং কলেজকালেও কলকাতায় গিয়েছি। কিন্তু কলকাতা আমার একান্ত অভিনিবেশের শহর হলো বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের পর থেকেই। (পৃঃ ৫)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে এম এ পাস করে তিনি কলকাতায় এলেন। সালটি ১৯৪৪। কিছু দিন একটি এমএ ক্লাসের ইংরেজির ছাত্রীর টিউশনি এবং হুগলি ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজের ইংরেজি বিভাগে প্রভাষক পদে চাকরি করলেন। কিন্তু কলেজে এবং মাদ্রাসায় তিনি বাংলাও পড়াতেন। তিনি লিখেছেন, 'হুগলির কথা যতটুকু মনে আছে তাতে বলতে পারি যে তখনকার হুগলি ছিল একটি পরিচ্ছন্ন শান্ত জীবনধারার শহর।' (পৃঃ ৪০)।

কলকাতায় অতি দ্রুত তিনি সাহিত্য-সহচর পেলেন কাজী আফসার উদ্দিন আহমদ, ফররুখ আহমদ এবং সিকান্দার আবু জাফরকে। এই তিনজনের মধ্যে ছিল 'পারস্পরিক বিশ্বাসের একটি বিকিরণ' যা তাঁকে স্পর্শ করেছিল।

শওকত ওসমানের সাথে তাঁর পরিচয় হয়েছিল আরো আগে। কিন্তু 'পরম নির্ভরতার বন্ধুত্ব' স্থাপিত হতে কিছু বাধা ছিল। অবশ্য জীবনের শেষ দিন অবধি দু'জনের সম্পর্ক ছিল খুবই ঘনিষ্ঠ, সাহিত্যসাধনা ও পারিবারিক আন্তরিকতা সেখানে সক্রিয়। তা ছাড়া গোলাম কুদ্দুস, মতিউল ইসলাম, আহসান হাবিব, হাবিবুল্লাহ বাহার ও আবুল কালাম শামসুদ্দীনের সাথে পরিচয় ঘটে কিছু দিন পর, তখন তিনি নিজে একজন উদীয়মান কবি ও প্রবন্ধকার। শেষোক্ত দু'জনের সম্পাদকীয় পৃষ্ঠাপোষকতা তাই অনিবার্য ছিল তাঁর মতো, অন্যদের ক্ষেত্রেও। কলকাতার পটভূমিতেই পরিচয় ঘটল আবু রুশদের সাথে। কিন্তু সৈয়দ সাহেবের মতে, তিনি নিজেকে বিচ্ছিন্ন রা র অঙ্কিত চিত্র ছিল 'নির্মম নির্ণেয়তায় অনবদ্য এবং চাতুর্যময়।' (পৃঃ ৭)। খতেন এবং সবার দিকে কৌতুকের সাথে দৃষ্টিপাত করতেন। এর ফলে তাঁ

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর সাথে পূর্বপরিচয়ের সূত্র সত্ত্বেও কলকাতার জীবনে তাঁকে 'মহিমান্বিত' মনে হয়েছে এবং তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করেছেন 'এক অবরুদ্ধ প্রতাপের'। আবুল হোসেনের সাথেও পরিচয় ঘটে এ সময়।

জুলফিকার হায়দার ও নৃপেন্দ্র কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের দৃষ্টান্তে তিনি কাজী নজরুল ইসলামের 'বিশ্বাসের সত্তাকে' বিশ্লেষণ করতে প্রয়াস পান। তাঁর কাছে মনে হয়েছিল :

'কলকাতা এক বিচিত্র নগর। এখানে লৌকিক-অলৌকিক হাত ধরাধরি করে আছে। এখানকার মানুষ যে কত বিচিত্র বিষয় আঁকড়ে আছে তার অন্ত নেই।' (পৃঃ ২০)।

এর কিছু বাস্তব চিত্র তিনি কালিঘাট ও নাখোদা মসজিদ পরিদর্শন থেকে তুলে ধরেন। অলৌকিকের প্রতি মানুষের বশংবদ জীবনের কয়েকটি ছবি তিনি উপস্থাপন করেন :

তখনকার কলকাতা ছিল সত্যি বিচিত্র ভুবন। (পৃঃ ২৯)। আমার দৃষ্টিতে, কলকাতার বৈচিত্র্য হচ্ছে প্রাচীন এবং আধুনিককে নিয়ে বেঁচে থাকার মধ্যে। পরিবর্তন হচ্ছে শহরের বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত মূর্তিগুলোর এবং রাস্তাগুলোর নাম। (পৃঃ ৩৩)।

এই গ্রন্থে তাঁর শিক্ষক কাজী আবদুল ওদুদ, মোহিতলাল মজুমদার এবং অভিভাবক স্থানীয় আবদুর রহমান খাঁ প্রমুখের কথা যেমন রয়েছে, তেমনি পাই শাহাদাত হোসেন, এস ওয়াজেদ আলী, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, কালিদাস নাগ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, নরেশ গুহ, অজিত দত্ত, সমর সেন, আবদুল কাদির, আবুল মুনসুর আহমদ, রশীদ করিমের খন্ডচিত্র। প্রায়ই রেডিওতে কর্মসম্পাদন সূত্রে তাঁদের সাথে তাঁর পরিচয় ঘটে। তা ছাড়া আব্দুল হালিম গজনবী (সমাজপতি ও রাজনীতিজ্ঞ), জহুর হোসেন চৌধুরী (তথ্য বিভাগের কর্মকর্তা) ও লেডি রানু মুখার্জি (শিল্পরসিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব) প্রমুখের সাথে প্রতিষ্ঠিত হয় তাঁর যোগসূত্র।

অধ্যাপক আহসানের মতে, 'একজন মানুষের সাংস্কৃতিক স্বভাব বোঝা যায় তার খাদ্যস্বভাব পরীক্ষা করলে'। (পৃঃ ৫৫)। কলকাতায় অবস্থানকালে বিভিন্ন প্রকারের খাবারের স্বাদ গ্রহণ ছাড়াও জনপ্রসিদ্ধির কারণে তিনি স্বয়ং ভীম নাগের সন্দেশ, কেসি দাসের রসমালাই এবং জলযোগের দই খেয়ে দেখেছেন। আরেক পর্যায়ে তিনি শাহেদ সোহরাওয়ার্দীর বিবিধ গুণাবলির পরিচয় দিতে গিয়ে তাঁর ভোজনরসিকতার কথা বলেন।

অল ইন্ডিয়া রেডিওর অফিসে কথিকা পাঠ করতে গিয়ে সৈয়দ সাহেবের ধারণা হয়েছিল, সেখানে চাকরি পেলে 'আধুনিক সংস্কৃতির একটি উচ্ছল জীবনকে' তিনি পাবেন। দ্রুত তাঁর আশা পূর্ণ হলো। বলা বাহুল্য, উপরোল্লিখিত অনেক ব্যক্তিত্বের সাথে তাঁর পরিচয় রেডিওর কর্মসূত্রে। সেখানে বহু বিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পীর সাথে তাঁর পরিচয় ঘটে – পঙ্কজ মল্লিক, ফৈয়াজ খাঁ, ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ, ওঙ্কারনাথ ঠাকুর, বিনায়ক পটবর্ধন এবং নবীনদের মধ্যে তালাত মাহমুদ, আবদুল আহাদ ও কলিম শরাফী প্রমুখ।

সঙ্গীত বিশেষজ্ঞ ড. আরনল্ড বাকে এবং নাজির আহমদ, কবি জসীমউদ্দীনের সাথেও তাঁর বহু যোগাযোগ ঘটে। একপর্যায়ে তিনি লেখেন:

সঙ্গীতের রাজ্যে কখনো প্রবেশ না করলেও 'কবিতার জন্য সঙ্গীতের অনুভূতি একান্ত প্রয়োজন'। (পৃঃ ৫৭)। তাই সঙ্গীতের মূর্ছনা এবং প্রত্যয় আমাকে চিরকাল অভিভূত করেছে।

কিছুটা ভিন্ন প্রকঙ্গে গিয়ে সৈয়দ আলী আহসান প্রায় দার্শনিকের মতো লিখেছেন :

মানুষের জীবনে মাঝে মাঝে রহস্যময়তা নামে এবং এখনো প্রত্যাশিত থাকে না কিন্তু যৌবনের যাত্রারম্ভে এগুলো তৈরি হয় কখনো কল্পনায়, কখনো বাস্তবে। (পৃঃ ৬০)।

বিপরীত লিঙ্গের কিছু মানুষের সাথে পরিচিতি, সামান্য সম্পর্ক নিয়ে যেসব জটিলতা তাঁর এবং সহকর্মীদের মধ্যে স্পর্শকাতর অভিজ্ঞতার জন্ম দিচ্ছিল তা নিয়ে তাঁর মন্তব্য :

একটা স্বাদু বৈকল্যের সম্ভাবনা আমরা সবাই সে সময় এড়াতে সক্ষম হয়েছিলাম। যেভাবে তখন নানাবিধ আকর্ষণ আমাদের মনকে বিচলিত করার জন্য প্রস্তুত ছিল, সে সময় সব আকর্ষণকে উপেক্ষা করে আপন কর্মে নিমগ্ন থাকা খুবই কঠিন ছিল। আমাদের সমষ্টিগত বিবেচনা সব সময়ই আমাদের কিছু কিছু কর্মধারাকে নিয়ন্ত্রিত করত, যার ফলে সম্ভাব্য বিপদ আমরা এড়াতে সক্ষম হয়েছিলাম। অহেতুক প্রবণতা যৌবনকালে অনেক সময় জাগে, তার সক্ষম নিবৃত্তির প্রয়োজন। আমরা জাতি এবং সমাজজীবনের একটি সন্ধিলগ্নে বাস করতাম। তাই সর্বদা সজাগ থাকতে হতো, ভুল পদক্ষেপের সম্ভাবনায় শঙ্কিত থাকতে হতো। (পৃঃ ৭২)।

হাওড়ার একজন পুলিশ কর্মকর্তার কন্যার সাথে তাঁর বিবাহের প্রসঙ্গটি তাঁর জীবনে এবং উপর্যুক্ত গ্রন্থে একটি মূল্যবান অধ্যায়। তবে মনে হয়, কন্যার মুখদর্শন না করেই পরোক্ষ গুণাবলির মুগ্ধতায় শুভকর্মটি সম্পাদনে তিনি এগিয়ে গিয়েছিলেন : ৭ জুলাই, ১৯৪৬। কলকাতার হিন্দু-মুসলমান নারী-পুরুষ, অনেক সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব বিবাহ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন বলে জানা যায়।

মহাযুদ্ধের শেষ পর্বে কলকাতায় নর-নারীর সম্পর্ক নিয়ে বিকৃত রুচির কিছু দৃষ্টান্ত তিনি তুলে ধরলেও তা নিয়ে কলকাতাকে বিচারের পক্ষপাতী

নন (পৃঃ ৭৮)। তাঁর কাছে কলকাতা শহরের প্রতি মোহগ্রস্ততার ভিন্ন কারণ রয়েছে। চারপাশে সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলের বিস্তৃতি তাঁকে মুগ্ধ করত। তাঁর মতে :

> চল্লিশের দশকে কলকাতা ছিল সবারই শহর। হিন্দু এবং মুসলমান উভয়েই কলকাতা শহরে সমমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত ছিল। শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রগামী ভূমিকা ছিল না বটে, তবে সে ক্ষেত্রেও মুসলমানরা একেবারে নিশ্চিহ্ন ছিলেন না। অল্প যে ক'জন ছিলেন তাঁরা নিজ নিজ মহিমায় প্রতাপের সাথে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। (পৃঃ ৮৪)।

বিস্তৃতভাবে তিনি লিখেছেন শাহেদ সোহরাওয়ার্দীর কথা। যাঁর বন্ধু সুধীন দত্ত, বিষ্ণু দে, দিলীপ কুমার রায় এবং অন্য দিকে আবদুল হালিম গজনবীর কথা যাঁর বন্ধু নলিনী রঞ্জন সরকার ও লেডি রানু মুখার্জি প্রমুখ।

প্রবাসী সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সাম্প্রদায়িক মনোভাব নিয়ে লেখা সম্পাদকীয় ও বাগেশ্বরী শিল্প প্রফেসররূপে নিয়োগের ক্ষেত্রে শাহেদ-বিরোধিতার কথা উল্লিখিত হয়েছে। অথচ রবীন্দ্রনাথ সমর্থন করেছিলেন শাহেদকে। তাই তিনি ওই পদে সুনামের সাথে অধিষ্ঠিত ছিলেন এক দশকের বেশি সময়। (১৯৩২-১৯৪৩)।

কলকাতার সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের একটা দৃষ্টান্ত তিনি তুলে ধরেছেন যা আমাদের অনেকের অজানা :

> কলকাতার সামগ্রিক জীবনধারায় উর্দু এবং বাংলা সমান্তরালভাবেই ছিল। একটি সৌজন্য বা পারস্পরিক সাম্যতা নিয়ে এ দু'টি ভাষা কলকাতায় অনেক পরিবারের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ছিল। (পৃঃ ৬৯)।

অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কলকাতায় মুসলিম রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ও তিনি জানিয়েছেন, মাওলানা আকরম খাঁ, তাঁর সহকর্মী আবুল কালাম শামসুদ্দীন (*আজাদ ও মোহাম্মদী*), মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন (*সওগাত* সম্পাদক) যার সৌজন্যে তিনি মুসলিম শিল্পী আবদুল মঈন, আবুল কাসেম ও জয়নুল আবেদীনকে রক্ষণশীল মুসলিম সমাজে জনপ্রিয় হতে দেখেছেন, হাবিবুল্লাহ বাহার ও বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদ (*বুলবুল*), নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান (সম্পাদক *ছায়াবীথি*), শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক, সৈয়দ বদরুদ্দোজা, সৈয়দ নওশের আলী, খাজা নাজিমুদ্দীন, জালালউদ্দিন হাসমী, আবুল হাসেম ও শহীদ সোহরাওয়ার্দী,

আবদুর রহমান সিদ্দিকী (*স্টার অব ইন্ডিয়া* পত্রিকার সম্পাদক এবং বিধান চন্দ্র রায়ের বন্ধু), বিচারপতি নাসিম আলী ও তৎপুত্র বিচারপতি মাসুদ, বিচারপতি তারিক আমীর আলী প্রমুখ।

এসব ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মুসলমান নাগরিক কলকাতার স্থানীয় মুসলমানদের আশ্বাস এবং সাহায্যের হস্ত প্রসারিত করেন, বিশেষ করে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের জটিলতা নিয়ে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, ধ্যান-ধারণা প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যক্ত করেছেন :

> এক বীভৎস হত্যাকান্ড তৎসহ অগ্নিদাহন ও নারী ধর্ষণ কলকাতার বুকে ঘটে গেল ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট। ... কলকাতা শহরে যে তান্ডবলীলা আরম্ভ হলো তা ভারত ইতিহাসের এক কলঙ্ক'। (পৃঃ ১০২)।

তিনি আরো লিখেছেন :

> কলকাতার মহাহত্যাযজ্ঞ আমার সাংস্কৃতিক চিন্তার মধ্যে একটি বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিল (পৃঃ ১০৫)। ১৯৪৬ সালেই সব দেশে যে বিপুল পরিবর্তন এলো সে পরিবর্তনের পটভূমিতে অবস্থান করে কেউ নিজেকে নিরপেক্ষ কলে দাবি করার সাহস করত না। বিচ্ছিন্ন হওয়াকেই আমরা সবাই বিরোধ নিবৃত্তির সমাধান হিসেবে মেনে নিয়েছিলাম। (পৃঃ ১০৭)।
>
> তাছাড়া ভৌগোলিকভাবে আমরা তখন সমগ্র বঙ্গ অঞ্চল পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হবে এটাই ভাবতাম। ... আমরা কখনো কল্পনা করতে পরিনি, আমাদের একদিন কলকাতা ছাড়তে হবে। আমরা ভাবতাম পাকিস্তান যদি আদৌ প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে কলকাতা শহরে প্রবল প্রতাপে আমরা আমাদের প্রতিষ্ঠিত করব। (পৃঃ ১১০)।

কিন্তু সৈয়দ সাহেবের মতে,

> এরপর থেকে হিন্দুরা মুসলমানদের কাছ থেকে দূরে সরে গেল এবং তাদের তখন একটি বিস্ময়কর বিব্রত সময়ের মধ্যে বাস করতে হলো যাতে দিনযাপনের মধ্যে ক্ষুব্ধতা ছিল, অসহায়তা ছিল এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনিশ্চিয়তা ছিল (পৃঃ ১১০)

কিন্তু দেশ বিভাগের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হওয়ার আগেই অকস্মাৎ তাঁকে ঢাকায় বদলি করা হলো। তখন তাঁর প্রথম সন্তান জিনাতের জন্ম। ১৪

মার্চ, ১৯৪৭ এবং এর ৪০ দিনের মধ্যেই তিনি ঢাকায় বদলি হয়ে আসেন। তখন কলকাতা সম্পর্কে তাঁর ধারণা আর একটু স্পষ্ট করে জানিয়েছেন :

> ভালো হোক মন্দ হোক, কলকাতা শহরের আকর্ষণীয় একটি সত্তা ছিল। সর্বদাই এ শহর কর্মচঞ্চল এবং জীবনের বিচিত্র অভিব্যক্তির লীলাকেন্দ্র। নির্জন অন্তরাল থেকে প্রবল উন্মুক্ততা কলকাতা শহরকে একটি বিপুল বিস্ময়ের রাজ্যে পরিণত করেছিল। যাকে বলে পার্সোনালিটি বা ব্যক্তিত্ব, কলকাতা শহরের তেমনি একটি ব্যক্তিত্ব ছিল। এ ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ ভয়ঙ্কর এবং সর্বগ্রাসী। আমি এই ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ ছিলাম। আমার বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশের প্রথম উদ্দীপ্ত ক্ষেত্র ছিল কলকাতা। শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং ইতিহাসের বহু বিচিত্র কল্লোল কলকাতা শহরে উচ্চারিত হতো প্রতি মুহূর্তে। (পৃঃ ১১১)।

সৈয়দ আলী আহসানের পরবর্তী কলকাতা-কাহিনী রয়েছে তাঁর মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক স্মৃতিকথা *যখন সময় এল* (নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৯১) গ্রন্থে। সেখানে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে আমরা সর্বভারতীয় উদ্যোগের খবরাখবর যেমন জানি তেমনই উপনিবেশ-উত্তর কলকাতাকে পাই নতুন পরিচয়ে। এরপর ১৯৯৫ ও ১৯৯৬ সালে চক্ষু চিকিৎসার জন্য তিনি দু'বার সংক্ষিপ্ত অবস্থান করেন কলকাতায়। সেখানকার বুদ্ধিজীবী ও সাহিত্যিকদের সাথে সাক্ষাৎ ও অন্যান্য অনেক প্রসঙ্গ সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত সেই ভ্রমণবৃত্তান্ত দু'টি পৃথকভাবে মুদ্রিত আছে "কলকাতায় কয়েকদিন" ও "পুর্নবার কলকাতা" শিরোনামে, *সাপ্তাহিক রোববারে*।

রবীন্দ্রনাথ : তাঁর মন ও মননে

'গ্রামীণ পরিবেশে প্রকৃতির বিচিত্র কল্লোলে ধর্মীয় বিনয়ের পরিমন্ডলে' শুরু সৈয়দ আলী আহসানের কৈশোরের প্রথম পর্যায়। তখন রবীন্দ্রনাথের নাম তিনি শোনেননি। অল্প পরে বাংলার গৃহশিক্ষক তাঁকে এই নামের সঙ্গে পরিচিত করান। কিন্তু নয় বছর বয়সে আরমানিটোলা সরকারী বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে 'একটু নতুনভাবে পাঠ' করলেন রবীন্দ্রনাথকে। তবে যথার্থভাবে রবীন্দ্রকাব্য-চৈতন্যের উদয় ঘটলো আরো কিছু সময় পরে তিনি যখন ষষ্ঠ বা সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র। "সোনার তরী" কবিতা-পাঠ ও ব্যাখ্যা করলেন তাঁর শিক্ষক জুলফিকার আলী – টিচার্স ট্রেনিং কলেজের একটা প্র্যাক্‌টিস টিচিং ক্লাসে। শিক্ষকের সমাপ্তি অভিমত : 'ছবিটি খুব সুন্দর তাই নয়?' শুনে অনুসন্ধানী ছাত্র সৈয়দ আলী আহসান উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'খুব সুন্দর! কিন্তু ছবিটিতে কোনো রং নেই।' শিক্ষক আবার বোঝালেন। শান্তিনিকেতনে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ড্রয়িং শিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও ছবি এঁকে বিষয়টি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। সৈয়দ আলী আহসান পরবর্তীকালে লিখছেন, 'এভাবে আমরা শৈশবে কবিতাকে চিত্রকলার সঙ্গে সম্পর্কিত করতে সক্ষম হয়েছিলাম এবং রবীন্দ্রনাথকে আমাদের দেশের এবং প্রাণের অত্যন্ত নিকটের মানুষ বলে ভাবতে শিখেছিলাম। ... বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতিকে এবং জীবনের কলগুঞ্জনকে রবীন্দ্রনাথ যে কত বিচিত্ররূপে প্রভাময় করেছেন' তার প্রমাণ তিনি পেলেন সেই স্কুল জীবনে, *উৎসর্গ* কাব্য পাঠে। এরপর *রাজর্ষি* উপন্যাসের নাটকীয়তা, পরবর্তী পাঠ্য সংকলনের কবিতায় তিনি রবীন্দ্রনাথকে আরেকটু ঘনিষ্ঠভাবে জানলেন। ১৯৩৭ সালে রবীন্দ্রনাথের অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে সহপাঠীদের সঙ্গে ব্যাকুল হয়ে তারবার্তা প্রেরণ করেছিলেন শান্তি নিকেতনে। ১৯৩৮ সালে কলেজ-ছাত্র সৈয়দ আলী আহসান হলেন রাজনীতি-সচেতন। প্রাদেশিক পরিষদে মুসলমানদের সংখ্যা অনুপাতে আসন নির্ধারণের ব্যাপারে বৃটিশ সরকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে হিন্দু মহাসভার ... প্রতিবাদ সভায় রবীন্দ্রনাথ সভাপতিত্ব করলেন' – এ সংবাদ

তাঁকে পীড়িত করল। এ সময়ে 'আধুনিক' ও 'প্রগতিপন্থী' কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে রবীন্দ্রবিরোধী ভাবধারাও মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। কিন্তু কলেজ-শিক্ষক কাজী আব্দুল ওদুদের প্রভাবে তাঁর উপর কবিতায় রবীন্দ্রনাথের অধিকার পূর্ণভাবে সমর্থিত থাকল। ১৯৪০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার আনুষঙ্গিক পাঠক্রমে তিনি হলেন মোহিতলাল মজুমদারের অনুরাগী ছাত্র। তাঁর মতে, মোহিতলাল ছিলেন রবীন্দ্রনাথের 'প্রচন্ড সমালোচক' কেননা তিনি একমাত্র রোমান্টিক ভাবাবহের কবি। তবে রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল কিন্তু মোহমুগ্ধতা ছিল না।'

১৯৪১ সালে রবীন্দ্র-তিরোধানে শোকাহত সৈয়দ আলী আহসান একটি কবিতা রচনা করেছিলেন। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শোকসভায় সেটি পাঠের সুযোগ তিনি পাননি। সম্ভবত কবিতাটি কোথাও প্রকাশিতও হয়নি। এসময়ে বা তার কিছু আগে তিনি ও তাঁর বন্ধু মাহবুবুর রহমান খান একটা হাতে-লেখা ম্যাগাজিন সংকলন করেছিলেন যাতে রবীন্দ্রভক্তি পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে এম. এ. ডিগ্রী লাভ করে তিনি কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের জন্য কলকাতায় এলেন। কলেজ-শিক্ষকতা, প্রাইভেট টিউশনি এবং অবশেষে রেডিওর চাকুরীতে তিনি থিতু হলেন। পরবর্তীকালের মুখ্য মুসলমান কবি-সাহিত্যিকরা হলেন তাঁর বন্ধু। কলকাতার কিছু বিশিষ্ট হিন্দু বুদ্ধিজীবীর সঙ্গেও ঘটল পরিচয় আর অন্ত রঙ্গতা। কিন্তু সময়টা ছিল জটিল – দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা ছিল ক্রমবর্ধমান। ব্রিটিশ ভারতের মুসলমান জনগোষ্ঠীর 'রক্ষাকবচ' রূপে পাকিস্তান আন্দোলন তখন তুঙ্গে। সৈয়দ আলী আহসানের ভাষ্য – 'আমাদের সকলের কাছে তখন পাকিস্তান ছিল একটি বিরাট আদর্শ, ভৌগলিক বন্ধনীতে আবদ্ধ কোনো ভূখন্ডে ব্যাপ্ত নয়। কিন্তু ইসলামী আদর্শের তাৎপর্যবহ একটি অনুভূতিও' – ১৯৪৯ সালে পাকিস্তানপন্থী বুদ্ধিজীবীদের একটি বৈঠকের সূত্র ধরে সৈয়দ আলী আহসানের নামে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে আমরা পড়লাম : 'পাকিস্তানের আদর্শ ও সংহতির জন্য প্রয়োজন হলে আমরা রবীন্দ্রনাথকেও পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত থাকব।' পরে তিনি বুঝতে পারলেন উত্তাল যুক্তিহীন আবেগের পরিপ্রেক্ষিতে প্রকাশিত এই বিতর্কিত কথাগুলো তাঁর জন্য 'কাল হয়'। ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৬ থেকে পি. ই. এন. প্রভৃতি আন্ত

র্জাতিক সম্মেলনে যোগদানের ফলে ক্রমশ তাঁর মোহভঙ্গ হয়েছিল। ১৯৬১ সালে রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকীকে কেন্দ্র করে দেশে-বিদেশে মূল্যায়নের পালাবদল ঘটে। বিশ্বকবির উপযুক্ত সমাদরের সঙ্গে আমাদের স্বদেশপ্রেম এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি-পর্বের আবেগ-আলোড়ন সম্পৃক্ত হয়ে পড়ল।

মুক্তিযুদ্ধে সৈয়দ আলী আহসানের অনন্য ভূমিকা বিশেষ করে সে বছরই বিশ্ব ভারতীর ২২শে শ্রাবণের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথিরূপে তাঁর যোগদান ও কয়েকটি অশ্রুতপূর্ব ভাষণদান কিছু ঐতিহাসিক ঘটনা বটে! স্বাধীন বাংলাদেশে সরকারী নির্দেশে জাতীয় সংগীত তথা রবীন্দ্রনাথের 'আমার সোনার বাংলা'-র ইংরেজি অনুবাদ তাঁকেই করতে হয় এবং এখনও সেটিই বহাল রয়েছে যদিও প্রায় ক্ষেত্রেই অনুবাদকের নাম থাকে অনুল্লেখিত।

ষাটের দশকের প্রথম দিকেই রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে লেখা কয়েকটি কবিতা ছাড়া তাঁর প্রথম বড় কাজ – *রবীন্দ্রনাথ : কাব্য বিচারের ভূমিকা* গ্রন্থটি। ১৯৭৪ সালে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য থাকাকালীন বহু প্রাতিষ্ঠানিক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কর্মকান্ডের সাথে জড়িত থাকা সত্ত্বেও প্রতি অপরাহ্নে সময় করে শ্রুতিলিপির মাধ্যমে গ্রন্থটি সমাপ্ত করেন তিনি। শ্রুতিলিপিকার সাঁটলিপিতেই এটি গ্রহণ করেন বলে আমার ধারণা।

ভূমিকায় তিনি গ্রন্থটিকে 'রবীন্দ্রনাথের উপর একটি পরিকল্পিত বিস্তৃত আলোচনার মুখবন্ধস্বরূপ' বলে উল্লেখ করেন এবং জানান, 'মূলতঃ রবীন্দ্রনাথের কবিতার শব্দ ব্যবহারের বিচিত্র তাৎপর্য পরীক্ষা করাই' তাঁর উদ্দেশ্য এবং সে সূত্রে রবীন্দ্রকাব্যের বিষয় বৈচিত্র্য ভারতীয় প্রাচীন কাব্য-ধারার সঙ্গে তার সম্পর্ক এবং এতদসম্পর্কিত অন্যবিধ আলোচনাও এসেছে।' রবীন্দ্র-কাব্য বিষয়ে অতি মূল্যবান এই গ্রন্থ সম্পর্কে দুই বাংলার কোথাও তেমন গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে কিনা আমাদের জানা নেই। তবে গ্রন্থপাঠে সমুচিত আনন্দিত আচার্য প্রবোধচন্দ্র সেন 'একপ্রকার রাজসিক বদান্যতায়' তাঁর প্রতি প্রশংসা বাক্য (অধ্যাপক আহসানের ভাষ্যে) সম্বলিত একটি দীর্ঘ পত্র লেখেন। যা বর্তমান দ্বিতীয় প্রকাশে (১৯৮৮) মুদ্রিত আছে। ড. সেন অধ্যাপক আহসানকে "সাহিত্যাচার্য" রূপে সম্বোধন করেন এবং লেখেন :

> এই কয়দিনে আপনার রবীন্দ্রনাথ বইটি অনেকখানি পড়া হয়েছে। পড়ে আমি বিস্মিত, মুগ্ধ, অভিভূত। এটা অত্যুক্তি নয়।

রবীন্দ্রসাহিত্যের এমন বিচার এর পূর্বে আমি পড়িনি। সব বিচারই যেন মস্তিষ্ক-প্রসূত, সাহিত্যিক ন্যায়সূত্রের ছকে ফেলে পরিমাপ করার প্রকাশ অথবা নিছক উচ্ছ্বাস। আপনার এই বিচার যেন এক কবিসত্তা দিয়ে আর এক কবি সত্তা প্রকাশ করা। এ বিচার লজিকের বিচারও নয়, ভাবাবেগের উচ্ছ্বাস তো নয়ই।

পত্রের উপসংহারে অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন আরো কিছু মূল্যবান বক্তব্য উপস্থাপন করেন, একটু দীর্ঘ হলেও তা আমরা এখানে উদ্ধৃত করছি:

'কবির নূতন দৃষ্টি আমাদের নূতন দৃষ্টি দেয়। সে নূতন দৃষ্টিতে একদিকে আমরা নিজেদেরই যেন নূতন করে দেখি, নূতন করে চিনি। কবিদের দেওয়া এই নূতন দৃষ্টিতে আমরা জগৎ, জীবন ও সাহিত্যকে নূতন করে পাই। তাতে নূতন তাৎপর্য উপলব্ধি করি। অর্থাৎ কবির সৃষ্টি আমাদেরও নূতন করে সৃষ্টি করে, নব নব জন্ম দান করে। ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে একথা সত্য। কিন্তু তার একটা অন্তরায় আছে তা আমাদের আলোক গ্রহণের অক্ষমতা। সূর্যের আলো হীরক খন্ডের উপরে পড়ে প্রতিচ্ছুরিত হয়, মৃৎখন্ড সে আলোক প্রতিচ্ছুরিত করতে পারে না। আমাদের অক্ষম হৃৎপিন্ডও তেমনি কাব্যের আলোক প্রতিফলিত করতে পারে না, যাঁর হৃদয় কাব্যের আলোক হীরক খন্ডের মতো প্রতিচ্ছুরিত করতে পারে তিনিই যথার্থ সমালোচক। শ্রেষ্ঠ কবির ন্যায় শ্রেষ্ঠ সমালোচকও দুর্লভ। কালিদাসকে দেড় হাজার বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে গ্যাটে ও রবীন্দ্রনাথের মতো সমালোচকের জন্য। এখন আমরা কালিদাসকে যেভাবে বুঝি এই দুইজনের আবির্ভাবের পুর্বে সেভাবে বোঝা সম্ভব ছিল না। আলোক প্রতিচ্ছুরিত করাও এক প্রকার সৃষ্টি। অন্ধকারে প্রদীপশিখা তিমিরাচ্ছন্ন পথকে নূতন করে সৃষ্টি করে। যথার্থ সমালোচকের হাতের দীপশিখাও তেমনি কাব্যের পথকে সাধারণ পাঠকের দৃষ্টিগোচর করে, তাদের চোখে নূতন দৃষ্টি দিয়ে কাব্যের সৌন্দর্যলোককে অভাবিত আভায় উদ্ভাসিত করে। আপনার এই বই খানিও সঞ্চারিনী দীপশিখার মতোই পাঠকচিত্তকে রবীন্দ্রসাহিত্য সরণিতে চালিয়ে নিয়ে চলেছে অপূর্ব নন্দনলোকের আশায়, অন্তত আমার তাই মনে হয়েছে। পথের এদিকে ওদিকে

কত হীরের টুকরো পড়ে ছিল সাধারণ নুড়ির মতো। আপনার হাতের দীপশিখা থেকে আলো পড়তে সেগুলি ঝক ঝক করে উঠল; বোঝা গেল সেগুলি সাধারণ নুড়ি নয়, হীরের টুকরো। আর কোনো সমালোচনা পড়েই আমার চমক লাগেনি। তখনই বুঝতে পারলাম যথার্থ কবিসত্তাই অন্য কবিসত্তাকে উদ্‌ঘাটিত করতে পারে, উদ্ভাসিত করতে পারে। আমার পরম সৌভাগ্য আমি একখানি বই পড়বার সুযোগ পেয়ে গেলাম। দীর্ঘ জীবন লাভের এই সার্থকতায় অন্য সব ব্যর্থতাবোধ তুচ্ছ হয়ে গেল। আর এই অমূল্য বইখানি আমাকেই উৎসর্গ করেছেন আপনার অন্তরের প্রীতিবশে – ভেবে আমি আনন্দে ও কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হয়েছি। আপনার এই প্রীতির নিদর্শনকে শিরোধার্য করলাম। আমার রবীন্দ্র সমালোচনা – সংগ্রহের পুরোভাগে হবে এটির স্থান।

গ্রন্থটিতে উপশিরনাম খচিত কোনো অধ্যায় বিভাজন নেই, রয়েছে সংখ্যাবাচক এবং তা ৯টি। আমরা খুব সংক্ষেপে তার পরিচয় নেবার প্রয়াস পাবো। প্রথম অধ্যায়ে সমালোচক সৈয়দ আলী আহসানের যা লক্ষ্য তা হল : '... রবীন্দ্রনাথ আমাদের বাংলা ভাষার একজন কুশলী কবি। সুতরাং বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাঁর কাব্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করতে হবে।' অতএব 'রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক কবিতায় শব্দ ব্যবহারের কৌশল এবং দক্ষতা বিশেষভাবে পরীক্ষা' করা তাঁর অভিষ্ট। তিনি প্রথমেই লক্ষ্য করেছেন রবীন্দ্রনাথ 'মানব জীবনের উন্মোচন, বিকাশ এবং জীবনযাত্রায় প্রকৃতির দাক্ষিণ্যকে যেভাবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন তার উৎস ছিল বেদ ও উপনিষদ। উপনিষদ-প্রসঙ্গ আমরা অন্যত্র পাই কিন্তু অধ্যাপক আহসান বেদ, এমনকি রবার্ট ফ্রস্ট, টি. এস. ইলিয়ট, কীট্‌স, মধুসূদন প্রভৃতির উদাহরণ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের কাব্য-বৈশিষ্ট্য নিরূপনে অগ্রসর; তাঁর মতে :

ক. রবীন্দ্রনাথের কবি-চেতনায় সমকালীন অপেক্ষা চিরকালীন বোধ প্রবল; রবীন্দ্রনাথের সব সময় চেষ্টা ছিল সর্বজনীন মানবপ্রাণের নিগূঢ় চৈতন্যের উদ্বোধন করা;

খ. ... রবীন্দ্রনাথের বাংলা কাব্যধারায় ঐতিহ্যের সঙ্গে একটি আদিম সুর মূর্ছনা সম্পর্কিত। তাই কবিতা ও গানের ছন্দ ও সুরের মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে বাংলা কাব্যধারার সঙ্গে নিগূঢ়ভাবে সম্পর্কিত পাব।'

গ. সন্দেহ নেই, রবীন্দ্রনাথ নির্বিশেষকে নিগূঢ়তম ব্যঞ্জনায় উপলব্ধি করতে চেয়েছেন কিন্তু কখনো কখনো বিশেষকে গ্রহণ করে, যেমন "পদ্মা" কবিতায় –

'হে পদ্মা আমার
তোমায় আমায় দেখা কত শত বার'

বিশেষের ব্যঞ্জনায় একটি 'মহার্ঘতা' এনেছেন।

ঘ. '... কবিতার জন্য বিশেষ প্রয়োজন হবে বাক-প্রতিমা গঠন, উৎপ্রেক্ষার প্রয়োগ, প্রতীক এবং পুরানের ব্যবহার।' ... 'আমার বক্তব্য হচ্ছে যে রবীন্দ্রনাথকে জানতে হলে তিনি যে শুধু নির্বিশেষের কবি এই বললেই যথেষ্ট হয় না, সেই নির্বিশেষকে গ্রহণযোগ্য করবার জন্য তিনি যে-সমস্ত কৌশল অবলম্বন করেছিলেন সেই কৌশলগুলো বিবেচনা করতে হবে। ... রবীন্দ্রনাথের কবিতা প্রথমাবধি এই অরূপকে, এই দৃষ্টির অতীতকে আবিষ্কার করতে চেয়েছে।

'আমি যে রূপের পথে করেছি অরূপ মধু পান
দুঃখের রসের মাঝে অমৃতের পেয়েছি সন্ধান।'

দ্বিতীয় অধ্যায়ে বেদ এবং উপনিষদের সঙ্গে রবীন্দ্রকাব্যের সম্পর্ক নির্ণয় করা হয়েছে যাতে দেখা গেছে রবীন্দ্রনাথ জ্যোতিকে কামনা করেছেন। অন্ধকার থেকে আলোকে বিনির্গমনের কথা বলেছেন এবং মানুষের জন্য শুভ এবং কল্যাণকে কামনা করেছেন। "স্বর্গ হইতে বিদায়" থেকে "বসুন্ধরা" "পৃথিবী" কিংবা "এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি" অবধি অসংখ্য কবিতায় রবীন্দ্রনাথ মানুষের সঙ্গে পৃথিবীর সম্পর্কের রহস্য নির্ণয়ের প্রয়াস পেয়েছেন। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক আহসানের মৌলিক বক্তব্য এই খানে যে, 'মানুষের দৃষ্টিতে যে বিস্ময় জেগেছে, বেদে সে বিস্ময় চিত্রিত, রবীন্দ্রনাথের কাব্যে একই বিস্ময় বিমূর্ত। কিন্তু তবু রবীন্দ্রনাথের কবিতায় একটি পার্থক্য এসেছে, সেই পার্থক্য হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ সমুদ্রের বর্ণনা মানব জীবনের মমতার সম্বন্ধে বিভিন্ন রূপকের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন।' তাছাড়া তাঁর মতে, 'রবীন্দ্রনাথের কাছে সবচেয়ে বড় হল স্নেহ ও মমতার উপঢৌকন। ... পৃথিবীতে মানুষের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধন মমতার দ্বারাই সুরক্ষিত হয়।' তিনি দেখিয়েছেন যে, রবীন্দ্রনাথের 'প্রকৃতি বিবেচনা যেমন বেদের বাণীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত তেমনি উপনিষদের মন্ত্রে অগ্নিতে, জলেতে ও বিশ্বচরাচরে সর্বত্র অখন্ড ঐক্যের যে কথা বলা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সাধনায় সেই ঐক্যের সন্ধান আমরা পাই।' এর ফলশ্রুতি হচ্ছে, 'রবীন্দ্রনাথ বিপর্যয়ের মধ্যে একটি শান্ত অনাবিল প্রীতির সংবাদ এনেছিলেন, সে সংবাদ হচ্ছে ভালবাসার সংবাদ।' এই সূত্রে

অধ্যাপক আহসান আরও জানান, 'তিনি তাঁর পূর্ববর্তী কোনো কবির অনুকরণ করেননি। ... রবীন্দ্রনাথের কবিতার মধ্যে একটি চলমানতা আছে, একটি সজীবতা আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি আপন মৌলিকতার মধ্যে ঐতিহ্যকে রক্ষা করেছেন।'

তৃতীয় অধ্যায়ে তাঁর প্রাথমিক বক্তব্য হল : রবীন্দ্রনাথ 'কোনো একটি ধর্মগত শৃঙ্খলার মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ করেননি। ... কেননা যে বিশেষের অভিব্যক্তি তাঁর কবিতায় ঘটেছে সে বিশেষ হচ্ছে আলোকের, সৌন্দর্যের, সত্য এবং আনন্দের।' লেখক আবিষ্কার করেছেন যে মানব স্বভাবের যে দুটি দিক বিশ্বাসের এবং যুক্তির দিক, রবীন্দ্রনাথ প্রথম দিকটি অর্থাৎ 'বিশ্বরহস্যে বিশ্বাস' করতেন কিন্তু তার কোনো সঠিক উত্তর নেই। 'এই যে রহস্য আবিষ্কারের চেষ্টা অথচ আবিষ্কার করতে না পারা, এটাই রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতাকে সুদুর্লভ মাহাত্ম্যে মন্ডিত করেছে।'

তবে তাঁর কবি জীবনের মতো ধর্ম জীবনও একই রহস্যময় ধারায় গড়ে উঠেছে। *শান্তি নিকেতন*, *মানুষের ধর্ম* প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি তাঁর বক্তব্য সমৃদ্ধ করেছেন। তাছাড়া *পূরবী*, *চিত্রাঙ্গদা* প্রভৃতি কাব্যের বহু উদ্ধৃতি এসেছে তবে সারকথা হল, *বলাকার* ১৯ নম্বর কবিতার দুটি পংক্তি –

'ভালোবাসিয়াছি এই জগতের আলো
জীবনেরে তাই বাসি ভালো।'

রবীন্দ্রনাথের এই চৈতন্যের সঙ্গে আটপৌরে জীবনের বিশেষ করে অর্থনৈতিক বৈষম্যের ফলে নির্যাতিত মানুষের চিত্র সুস্পষ্টভাবে আসেনি। কেননা, অধ্যাপক আহসানের মতে, 'কবিতার ক্ষেত্রে সে জগত তখনও পুরোপুরি নির্মিত হয়নি।'

চতুর্থ অধ্যায়ে কবিগুরুর ওপরে সংস্কৃত কাব্যের প্রভাব বিষয়ক আলোচনা 'প্রচুর এবং প্রবল' বলে ঘোষিত হলেও মূলত কালিদাসের প্রভাব নিয়েই বিশেষ রয়েছে।

কালিদাসের 'চিরায়ত বৈশিষ্ট্য' ও 'সচেতনতার পূর্ণকাম রূপশ্রী' কিন্তু রবীন্দ্রকাব্যে 'সমগ্রতা' সৃষ্টি করেনি। তবে তাঁর মতে, 'অসম্পূর্ণতাতেই কবিতাগুলোর লীলাময় মাধুর্য।' রবীন্দ্রনাথের কাব্যে সংস্কৃতের একটি নতুন পরিণতি ঘটেছে, নতুন সৃষ্টিতে। যে সৃষ্টি প্রাণবান ও গতিবান। সংস্কৃতের সঙ্গে প্রণয় রেখেও বন্ধন বিচ্ছিন্ন করেছে বলেই বাংলাভাষার সৃষ্টির কার্য নব নব অধ্যবসায়ে যাত্রা করতে প্রবৃত্ত হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে বাংলা কবিতায় আদিকাল থেকে প্রকৃতির ব্যাপক ব্যবহারের পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের অবস্থান নিয়ে আলোচনা রয়েছে। প্রকৃতির অনাবিল প্রশান্তি আচ্ছন্ন করেছিল রবীন্দ্রনাথের শৈশব। যৌবনে আকুল হয়েছেন বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চল দেখে ও নদীপথে ভ্রমণ করে। প্রকৃতিগতভাবে তিনি ছিলেন নিরাসক্ত। কিন্তু তাঁর 'একমাত্র আসক্তি ছিল প্রকৃতির প্রতি। জীবনের শুরু থেকে শেষদিন পর্যন্ত রচিত কবিতায় যে বিচিত্র প্রকৃতি-বিভূতির পরিচয় আমরা পাই তার সঙ্গে প্রাসঙ্গিকভাবে শেক্সপিয়ার, শেলী, কীট্‌স, গ্যাটে এবং কালিদাসের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে একটি মনোজ্ঞ আলোচনার সূত্রপাত ঘটিয়েছেন গ্রন্থকার।

ষষ্ঠ অধ্যায় তৈরি হয়েছে কবির উপকরণ সংগ্রহের বিষয়কে কেন্দ্র করে। দেশজ ও দেশের বাইরের বহুকিছু তিনি গ্রহণ করেছেন কিন্তু 'একটি বিশেষ সময়কালের রাজনীতি, সমাজনীতি বা অর্থনীতির দ্বারা রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যকলার ক্ষেত্রে শাসিত হয়েছেন এটা বলা যায় না। বলা যায় যে রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে মানুষকে স্বীকার করেছেন এবং মানুষকে সম্মান দিতে চেয়েছেন। যেহেতু তাঁর কল্পনা ছিল বিরাট, যেহেতু মানবের জন্য সর্বকালীন একটা ন্যায়ের কল্পনা তিনি করেছিলেন, তাই রবীন্দ্রনাথকে জীবনের প্রবহমানতা থেকে বিচ্ছিন্ন কবি হিসাবে আমরা বিবেচনা করবো না। *বলাকা*'র একটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথ একথাই বলেছেন :

'জীবনেরে কে রাখিতে পারে।
আকাশের প্রতি তারা ডাকিছে তাহারে।
তার নিমন্ত্রণ লোকে লোকে
নব নব পূর্বাচলে আলোকে আলোকে।
স্মরণের গ্রন্থি টুটে
সে যে যায় ছুটে
বিশ্বপথে বন্ধনবিহীন।'

সপ্তম অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ কাব্যবিচারে দৃষ্টিকে যে কতটা গুরুত্ব দিয়েছেন তার আলোচনা রয়েছে। অধ্যাপক আহসানের মতে, মনে হয় সকল সময় তাঁর সকল বক্তব্যই যেন মানব-সৃষ্টির অন্তসার। তিনি পার্ল বাক, শেলী, মধুসূদন, দান্তে, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, গোবিন্দ দাস, বিদ্যাপতি, ভুসুকু, কৃষ্ণাচার্য, তুলসীদাস, গৌতম বুদ্ধ, শেক্সপীয়ার, টি.এস. ইলিয়ট, কীট্‌স, রিলকে, ইয়েটস্ প্রভৃতির দৃষ্টান্তের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য

কবিকর্ম যথা, "উৎসর্গ", "বিজয়িনী", "সোনার তরী", "বর্ষশেষ", *মুক্তধারা* (নাটক), "কল্পনা" (হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে ময়ূরের মতো নাচেরে), "যেতে নাহি দিব", "বৈষ্ণব কবিতা", "বসুন্ধরা", (অশেষ), *রোগশয্যায়* (২০, ৪, ৮, ২২,), *আরোগ্য*, *জন্মদিনে* (১১) প্রভৃতিতে অসংখ্য রূপকল্প নির্মাণ করেছেন যা 'স্রোতের মধ্যে' প্রবাহিত হয়ে গেল, তিনিই শুধু পৃথিবী থেকে ক্রমশ হারিয়ে গেলেন অর্থাৎ কবির সৃষ্টি বেঁচে রইল এবং প্রবাহিত থাকল যুগ যুগ ধরে। যা প্রবাহিত থাকল তা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "আমি শূন্য আমি"।

কীট্‌সের ভিন্ন কৌশলের আলোচনা টেনেও রবীন্দ্রনাথ যে দৃশ্যময়তার মাধ্যমে আমাদের ইন্দ্রিয়জ অনুভূতিসমূহকে প্রকাশ করার প্রয়াস পেয়েছেন যা বাংলা কাব্যে আগে ছিল না, তা বোঝাতে সক্ষম হয়েছেন। তাছাড়া তাঁর মৌলিক বক্তব্য হল '... নিছক চিত্রনির্মাণের ক্ষেত্রে চিত্রকলার কলা কৌশল অনুসরণ করেছেন' রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর মতে, 'রবীন্দ্রনাথের কবিতার অধিকাংশই আলো এবং অন্ধকারের বৈপরীত্যের খেলা।' ("সোনার তরী", "পরশ পাথর", "আকাশের চাঁদ", "মানস সুন্দরী", "পত্রপুট", "শেষ লেখা" প্রভৃতি পাঠে এই বক্তব্য স্পষ্ট হবে)।

অষ্টম অধ্যায়ে লেখকের বক্তব্য কেন্দ্রীভূত হয়েছে বৈষ্ণব গীতি ও সাধনতত্ত্বে অনুসৃত 'প্রেমগত আনন্দের ঐশ্বর্য্য অনুসন্ধানে'। কিন্তু অনুরাগী লেখক রবীন্দ্রনাথের ভিন্নতা ও *ভানুসিংহের পদাবলী* থেকে *স্বপ্ন*, *মহুয়া* কাব্যগ্রন্থের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে দেখালেন। অধ্যাপক আহসানের মতে, 'রবীন্দ্রনাথ কখনও দেহকে ভিত্তি করে প্রেমের সূক্ষ্মতম ব্যঞ্জনাকে গ্রহণযোগ্য করতে চাননি। রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রেম একটি হৃদয়বেদ্য 'সূক্ষ্ম অনুভূতি'। তাছাড়া তিনি মনে করেন, 'বৈষ্ণব পদাবলী রবীন্দ্রনাথের কাছে একটি নিত্য সত্যকে উপলব্ধি করবার উপায় মাত্র। তিনি বৈষ্ণব পদাবলীর রূপক ও তত্ত্বের দায়ভার নিয়ে বিব্রত কখনও হননি বরঞ্চ তিনি এই পদাবলীর মধ্যে একটি অনন্যসাধারণ সৌন্দর্য এবং প্রেমের পরিচয় পেয়েছেন, যে সৌন্দর্য এবং প্রেমে তিনি সব সময় উদ্ভাসিত হয়েছেন। তাঁর মতে, 'রসতত্ত্বের কারণে নয় বরঞ্চ বৈষ্ণব কবিতার সুর, ছন্দ ও মূর্ছনা এবং শব্দের প্রথাগত আশ্রয়ে প্রকাশিত রসাবেশকে গ্রহণ করেছেন।' ড. সুকুমার সেন *মানসী* ও *সানাই* কাব্যে ব্যবহৃত পদাবলীর শব্দের একটি তালিকা উপস্থাপিত করেছেন। উপসংহারে তিনি লিখেছেন :

'বৈষ্ণব পদাবলী রবীন্দ্রনাথের ভালো লেগেছিল কয়েকটি কারণে, একটি হচ্ছে এ-গুলো একটানা গল্প নয়, দ্বিতীয়ত এ-গুলোতে বিচিত্র হৃদয়াবেগের সংঘাত আছে। তৃতীয়ত, বাংলা ছন্দের বিচিত্র বিন্যাস এই পদাবলীতে পাওয়া যায়। ... সুর, ছন্দ এবং হৃদয়াবেগের অভিসার যাত্রায় তিনি পদাবলীর সঙ্গে একাত্ম অনুভব করেছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে অভিষিক্ত হয়ে পদাবলী নতুন অর্থে সমৃদ্ধমান হয়েছে। কবি যেভাবে পদাবলীকে বিবেচনা করেছিলেন তত্ত্বজ্ঞরা সেভাবে কোনও দিন বিবেচনা করেননি। তাই বলতে পারি রবীন্দ্রনাথের মাধ্যমে আমরা পদাবলীকে নতুন তাৎপর্যে আবিষ্কার করেছি, এই আবিষ্কারের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কবিতারই নতুন বিশ্লেষণ আবিস্কৃত হয়েছে।'

নবম অর্থাৎ সর্বশেষ অধ্যায়ে সৈয়দ আলী আহসানের যা আসল অন্বিষ্ট অর্থাৎ কবিতায় শব্দ ব্যবহারের তাৎপর্য, – তাই আলোচিত হয়েছে। *চৈতালী*, *মানসী* কবিতায় যে অপূর্ব ধ্বনি-স্পন্দন নির্মিত হয়েছে ১৪ চরণের কবিতায় ৪০ বার নাসিক্যধ্বনি ব্যবহৃত হয়েছে এবং কতকগুলো শব্দের ক্ষেত্রে শব্দের পুনরাগমন লক্ষ্য করা গেছে। রমণী শুধুমাত্র যে বিধাতার সৃষ্টি তা নয়, পুরুষ তাকে আপন কল্পনায় মহিমাময়ী ও দুর্লভ করেছে – এই কথা ক'টির 'সুন্দর আবর্ত' রবীন্দ্রনাথ নির্মাণ করেছেন। তাঁর মতে, রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে বিবেচনা করে ছন্দকে কবিতার একটি 'অঙ্গাঙ্গী সম্পদ' বলে গ্রহণ করেছেন। বিশেষ প্রকাশ কৌশলের অনেকগুলি দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত হয়েছে, যেমন "মানস সুন্দরীর" একটি চরণ : 'তোমার আনম্র শিরে আনন্দ আদরে।' এখানে 'আ' ধ্বনি একটি বিশ্রাম-নির্ভরতা এবং পেলব সৌকুমার্যকে প্রকাশ করেছে। ধ্বনির চলমানতা, ছন্দের গতি নিয়ে রবীন্দ্রনাথের যে নিজস্ব আবিষ্কার তা অধ্যাপক আহসান বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। বাংলা শব্দতত্ত্ব, ছন্দ, ব্যাখ্যায় (রবীন্দ্রনাথের মতে 'ছন্দ মানেই ইচ্ছা') তিনি 'রূপরসিক' বা 'সুররসিক' হয়েছেন এবং 'তাই রবীন্দ্রনাথ কবিতায় ধ্বনির সাহায্যে প্রাণের গভীর কথাকে ব্যক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন'।

'প্রাণের গভীর কথা' রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে শুনে আকৈশোর সৈয়দ আলী আহসান তাঁর প্রতি গভীরভাবে অনুরাগী হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের 'ব্যাপক কবি-কর্মের ভূমিকা-স্বরূপ' যে বইটি তিনি মুক্তিযুদ্ধ থেকে ফিরে বহু

কাজকর্মের মধ্যে হেঁটে-বসে শ্রুতিলিপির মাধ্যমে লিপিবদ্ধ করিয়েছিলেন তাঁর কিছু পরিচয় এই নিবন্ধে উদ্ধৃত হল। পরবর্তীতে প্রতিটি কাব্য ধরে ধরে তিনি আলোচনা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত *সাহিত্য পত্রিকায়* মধ্য-আশি থেকে নব্বুইয়ের দশকে। দুর্ভাগ্যবশত সেটি এখনও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে আরো অনেক প্রবন্ধ ও কবিতা তিনি লিখেছেন। একবার একটি দৈনিকের সাহিত্যের পাতা সম্পাদককে সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থায় শ্রুতিলিপি দিয়ে "রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা" বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখে নিতে বাধ্য করেছিলেন তিনি। এই অত্যাশ্চর্য দৃশ্য দেখার সুযোগ এই প্রবন্ধকারের হয়েছিল। কথাটা উল্লেখ করতে হল এজন্য যে নিজে ঠিক এই বিষয়ে একটা প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে আমার কয়েক সপ্তাহ সময় লেগেছিল। দুটি ছোট উদ্ধৃতি দিয়ে আমরা আপাতত বর্তমান আলোচনার উপসংহার টানবো – একটি সৈয়দ আলী আহসানের কৈশোরিক রচনা, অন্যটি লেখা তিনি যখন খ্যাতির মধ্যগগনে :

'বাংলার কবি, ভারতের কবি
বিশ্বের কবি তুমি
সবাই জানায় প্রণতি তোমায়
তোমার চরণ চুমি।
(১৯৩৮/৩৯)

.....

'... তুমি আমার আকাশ
এবং শব্দের পরিসরে হৃদয়ের নীলাম্বর,
(*একক সন্ধ্যায় বসন্ত*, ১৯৬২)

তাছাড়া, তাঁর চূড়ান্ত 'সাক্ষ্য' হচ্ছে, 'আমার জীবনে, রবীন্দ্রনাথ দেবতা নয়, কিন্তু আমার কাব্যলোকের সারথী' (১৯৯৪)।

৭ই শ্রাবণ, ১৪১২/২২শে জুলাই, ২০০৫

নিবিষ্ট নজরুল নিরীক্ষা

বিংশ শতাব্দীর বিশ্বসাহিত্যে এক অনন্য কবিব্যক্তিত্ব কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)। বর্হির্বিশ্বের ইংরেজি, রুশ, তুর্কি ফরাশি, জাপানি, ফার্সি প্রভৃতি ভাষায় নজরুল সম্পর্কিত অল্পবিস্তর আলোচনা ও অনুবাদ হয়েছে। ১৯৩০ সালে তিনি বাঙালির এবং ১৯৭২ বঙ্গাব্দ থেকে তিনি বাংলাদেশের জাতীয় কবিরূপে জননন্দিত। রবীন্দ্রনাথ, মোহিতলাল মজুমদার, আবুল কালাম শামসুদ্দিন, কাজী আব্দুল ওদুদ, কমরেড মুজাফফর আহমদ, আবদুল কাদির, আবুল ফজল, বুদ্ধদেব বসু, শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী, সত্যেন্দ্র মজুমদার থেকে আজহার উদ্দিন খান প্রমুখ সমসাময়িক সমালোচকের শুভদৃষ্টি তিনি অর্জন করেছেন। সম্ভবত এদের কিছু পরে বা দু'একজনের সমকালে ঈষৎ ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নজরুল-বিচারে এগিয়ে এলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের তরুণ অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান (১৯২০-২০০২)। তাঁর গ্রন্থ : *নজরুল ইসলাম। নজরুল কাব্যের পরিচয়। প্রদর্শনী ও বিশ্লেষণ* ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়েছে জ্যৈষ্ঠ্য, তের'শ একষট্টি বঙ্গাব্দে, উৎসর্গপত্র ও ভূমিকায় ইছায়ী তারিখ রয়েছে : ১৬ই এপ্রিল, ১৯৫৪। লেখকের অগ্রজপ্রতিম বন্ধু মোহাম্মদ কাসেম গ্রন্থটি প্রকাশ করলেন তাঁর বাবুবাজারস্থ মখদুমী এ্যান্ড আহসানউল্লা লাইব্রেরী থেকে। প্রচ্ছদ শিল্পী : কামরুল হাসান, ১৬৮ পৃষ্ঠার বইয়ের দাম ছিল পাঁচ টাকা মাত্র। চিঠিতে লেখকের নামের নীচে রয়েছে রচিত; সংকলিত; সম্পাদিত এই তিনটি শব্দ। বিশ্ববিদ্যলয়ের ছাত্রদের কথা মনে রেখে কিংবা সদ্য স্বাধীন দেশে বইপত্র দুর্লভ বলে সম্ভবত গ্রন্থের "প্রতিধ্বনি" বিভাগে নজরুল রচনার ব্যাপক উদ্ধৃতি এবং নজরুল বিষয়ক নানান আলোচনা সমৃদ্ধ 'পরিশিষ্ট' ও 'পরিযোজন' সরবরাহ করা হয়েছে।

লেখক ভূমিকায় জানাচ্ছেন : 'এ গ্রন্থের পরিকল্পনা দ্বিবৎসরাধিক পূর্বের। তাছাড়া তাঁর ছাত্র এবং প্রকাশক-পুত্র মোহাম্মদ আবদুল কাইউম (পরবর্তীকালে স্বনামধন্য গবেষক) গ্রন্থের 'নির্দেশিকা' প্রস্তুত এবং গ্রন্থপঞ্জী ও জীবনপঞ্জীর জন্য উপাদান সংগ্রহের ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করেছেন।

গ্রন্থপঞ্জী প্রধানত কলকাতার বেঙ্গল লাইব্রেরীর ক্যাটালগ পরীক্ষা করে তৈরী হয়েছে। এসব তথ্য হয়তো বা অপ্রয়োজনীয় তবু উল্লেখ করছি, কেননা বইটি এখন দুষ্প্রাপ্য এবং আর কখনো এটি মুদ্রিত হবার সম্ভাবনাও হয়তো নেই। এটির একটি সংক্ষেপিত ও মার্জিত রূপ পাওয়া যাবে সৈয়দ আলী আহসানের *কবিতার কথা ও অন্যান্য বিবেচনা* গ্রন্থে (চট্টগ্রাম : বইঘর, ১৯৬৮, ঢাকা; গতিধারা ২০০১)। এখানে আরও একটি তথ্য উল্লেখ করা প্রয়োজন বোধ করছি – অধ্যাপক আহসান তাঁর জীবৎকালে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের ওপর বহু প্রবন্ধ লিখে গেছেন যাতে অন্ততঃ দুটি করে বই হতে পারে তবে এযাবৎকাল প্রকাশিত হয়েছে মাত্র একটি করে। তাও আবার নজরুলের ওপর বইটি এখন নিঃশেষিত ও দুর্লভ। সেজন্য আমরা এই বইটি থেকে কিছু প্রায় হারিয়ে যাওয়া পঙক্তি পুনরুদ্ধার করবো এবং সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো তাঁর অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি নিয়ে।

প্রথমত উল্লেখ্য হচ্ছে একটি উৎসর্গপত্র যা রূপলাভ করেছে এটি ছোট আধুনিক কবিতায় "নজরুল ইসলাম কে"!

এই বই হাতে পেয়ে একথা ভেবো না বন্ধু
সহসা সুযোগ পেয়ে কটু কথা বলেছি অনেক –
নিকষে সোনার রেখা দেখিবার ইচ্ছা ছিলো,
তাইতো লিখেছি কথা রূঢ়তায় হয়তো পীড়িত।
চোখের দৃষ্টির মত ঘন কালো মেঘে মেঘে
বিদ্যুৎ নিশ্চয় আছে এই ধারণায়
বজ্রের সহায় চাই, বৃষ্টির আবেশ চাই–
হয়তো বা সর্বনাশ কামনা করেছি।
এই কথা মনে রেখো
তোমারে দেখিতে যেয়ে
ঘাসের সবুজে আমি
আকাশের নীলকে দেখেছি।

গ্রন্থ শুরুর "পরিচয়" অংশে প্রথম অধ্যায় "আরম্ভ" দ্বিতীয় অধ্যায় "প্রথম পর্যায় ও বিপ্লবী মন" পরবর্তীকালে *কবিতার কথা ও অন্যান্য বিবেচনা* গ্রন্থে শিরনাম বদলেছে, রচনাংশেও কিছুটা পরিবর্তন এসেছে। সংযোজন-বিয়োজন মিলিয়ে শেষোক্ত গ্রন্থে মূল বইটি স্থান পেয়েছে ১৩১ থেকে ১৭৯ পৃষ্ঠায়। তাছাড়া "কবিতার কথা" প্রবন্ধের ২৫-৩০, ৪৬-৪৭ পৃষ্ঠায় এবং "ওয়াল্ট হুইটম্যান" প্রবন্ধে ২৫৪ থেকে ২৫৯ পৃষ্ঠায় নজরুল প্রসঙ্গ এসেছে অনিবার্যভাবে। নজরুল সম্পর্কে সৈয়দ আলী আহসানের যে

বক্তব্য তা মৌলিক বা পূর্বানুসৃত যাই হোক না তা বিবৃত হয়েছে শালীনভাবে ও সমালোচনা শাস্ত্রের রীতিনীতি মেনে :

> যে কারণে নজরুল সকলের প্রীতিভাজন হয়েছিলেন, তা হলো সাময়িক আদর্শ-বিশ্বাস। বাংলা সাহিত্যে তার ও একটি আশ্রয় আছে। এ আদর্শ-বিলাস হল প্রথমত, নিপীড়িতদের প্রতি মমত্ববোধ, দ্বিতীয়ত, দেশের স্বাধীনতার জন্য একটি উদগ্র আবেগ। দুর্দশাগ্রস্তদের জন্য তিনি সর্বদাই করুণা প্রকাশ করেছেন। দুর্বলদের প্রতি অনুরাগ ছিল তাঁর অসীম। কিছু তা অশ্রুতে রূপায়িত হয়নি-হয়েছে সংঘাতে আবর্তিত। নিপীড়িতদের তিনি বলেছেন বিদ্রোহ করতে। নিশ্চিন্তে বেদনাকে মেনে নিতে নয়।

পূর্ব প্রকাশিত গ্রন্থটির "আরম্ভ" অধ্যায়টি সমাপ্ত হয়েছিল একটি পঙক্তি দিয়ে 'নজরুল আমাদের প্রথম জাতীয় কবি'। পরবর্তী গ্রন্থে যোগ করলেন আরো কিছু কথা। যেমন, 'তিনি সুরশিল্পী, সংগীত সৃষ্টি তাঁর স্বভাব। শব্দ সাজিয়ে তিনি তাতে সুর দেন নি; সুর এসেছে প্রথমে, শব্দ এসেছে তার পরিশোধক হয়ে।...'

লক্ষ্য করা গেছে যে – সুর, ছন্দ ও শব্দ ব্যবহার নিয়ে কাজী নজরুল ইসলামের কাব্য প্রতিভার মুল্যায়ন করতে সৈয়দ আলী আহসানের অধিক অভিপ্রায় কিন্তু কালের দাবীতে অন্যান্য বিষয়ও তাতে সংযুক্ত হয়ে পড়ে। প্রকৃতি, মানবতা এবং ইসলাম প্রসঙ্গও তাঁর বিবেচনা থেকে বাদ পড়েনি।

সৈয়দ আলী আহসানের নজরুল বিষয়ক অপ্রকাশিত গ্রন্থটি নিয়ে এবার আলোচনা করা যাক। ন'টি প্রবন্ধসহ একটি নথি তিনি রেখে গেছেন। প্রবন্ধগুলো ১৯৯১ থেকে ১৯৯৯-র মধ্যে লেখা। নথিতে একটি ভূমিকাও রয়েছে, তবে দুর্ভাগ্যবশত তা তারিখবিহীন। তাছাড়া বইটির নাম নিয়েও সামান্য একটু জটিলতা আছে – "আহত গানের পাখি" না "গানের আহত পাখী"? প্রথম নামটি আছে নথির ওপর আর দ্বিতীয় নামটি আছে কোনো এক দৈনিকের বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধের শিরনামে। যাহোক, আমরা *আহত গানের পাখি গ্রহণ* করলাম শ্রুতিমধুর মনে হওয়াতে। নথিতে প্রদত্ত তালিকানুসারে প্রবন্ধসমুহের ক্রম হল : নজরুল ইসলাম : এক বচনাত্মক উত্তম পুরুষ; নজরুল ইসলামের কবিতায় ইসলামী জীবন প্রসঙ্গ; নজরুল ইসলাম – একটি নতুন বিবেচনা; *বুলবুল* কাব্যে ব্যথা এবং কামনা গানের আহত পাখি; নজরুলের সুরের জগৎ; আমি এবং নজরুল ইসলাম; ইসলাম ও নজরুল ইসলাম : একটি সমীক্ষা; নজরুল ইসলামের

সমসাময়িক কবিগণ। ন'টি প্রবন্ধের বাইরে আরও একটি প্রবন্ধ তাঁর কাগজপত্রের মধ্যে পাওয়া গেছে : "ফিরোজা বেগমের কণ্ঠে নজরুল গীতি"। এখানে আরেক দুর্ভাগ্য – প্রবন্ধটি খন্ডিত। সম্ভবত শেষের দুটি পৃষ্ঠা খোয়া গেছে। এই রচনা তাঁর দীর্ঘকালের শ্রুতি-লেখক বকুলের হাতের লেখা নয়, 'অন্য কাউকে দিয়ে তিনি এটি লিখিয়েছিলেন এবং এক পর্যায়ে কিছু অংশ স্বহস্তেও লিখেছেন যা তিনি সাধারণত গদ্য রচনার ক্ষেত্রে করতেন না বা করতে পারতেন না।

প্রাপ্ত তালিকার প্রথম প্রবন্ধ "নজরুল ইসলাম : এক বচনাত্মক উত্তম পুরুষ।" তাঁর মতে, 'আমাদের চলাচল অবস্থায়, কর্মের দায়বদ্ধতায় এবং প্রাত্যহিক ইচ্ছার প্রকাশে আমরা বহুবার আমাদের 'আমি' কে প্রকাশ করবার চেষ্টা করি। 'আমি'র যথার্থ সত্তা কিন্তু প্রতিদিনের উচ্চারণের মধ্যে সুস্পষ্ট হয় না। অতএব 'উপলব্ধির গভীরে' যেয়ে একে 'পুনরাবিষ্কার' করতে হবে। এর বিশেষ প্রক্রিয়া পাওয়া যাবে আধুনিক শিল্পকর্মে 'কিউবিষ্ট পদ্ধতিতে' জ্যামিতিক প্রক্রিয়ায় আকৃতিকে ভাঙচুর করে পুনর্নির্মাণের মধ্যে। তবে একজন কবি যখন তাঁর 'আমিত্ব'কে তুলে ধরেন তখন তিনি বিশ্বাসের ও মূল্যবোধের যেন একটি চৈতন্য নির্মাণ করেন, যে চৈতন্যে পাঠকের অংশীদারিত্ব গড়ে ওঠে।'... অতঃপর তিনি কোরআন শরীফ, সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরেজ কবি ডান ও আধুনিক ইসলামের প্রবক্তা ইকবালের দৃষ্টান্ত দিয়ে উপস্থাপন করেন নজরুলের *অগ্নিবীণা* কাব্যগ্রন্থে 'আমি'র সম্ভাষণ (১৯২২)। "বিদ্রোহী" কবিতার মধ্যে তিনি 'আমি'র তিনটি প্রকরণ লক্ষ্য করেন : 'একটি হচ্ছে প্রত্যয়বোধ, একটি অহংবোধ আর একটি প্রেমিকবোধ'। কীটস, শেলী ও ওয়ার্ডসওয়ার্থের উদাহরণ টেনে তিনি নজরুলের দায়বদ্ধতার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পরে মধুসুদন, রবীন্দ্রনাথ ও মোহিতলালের দৃষ্টান্ত এসেছে। তবে তাঁর মতে, নজরুল ইসলামের "বিদ্রোহী" কবিতাটি গর্বের এবং অহংকারের যেমন, তেমনি আবার বিনয় ও আত্মনিরীক্ষারও কবিতা। সম্পূর্ণ নতুন এক 'প্রমত্ত ভাষা'য় নজরুল এখানে 'একক মনুষ্যসত্তার জয়গান' গেয়েছিলেন। কালপ্রবাহে নতুন প্রত্যয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন দেশের মানুষকে। তাঁদের প্রতি তাঁর ভালোবাসাও অংগীকার ছিল প্রবলভাবে আন্তরিক।

দ্বিতীয় প্রবন্ধ "নজরুল ইসলামের কবিতায় ইসলামী জীবন প্রসঙ্গ"। অতি সাবলীল ভঙ্গিতে প্রবন্ধকার উপস্থাপন করেছেন তাঁর বক্তব্য :

নজরুল ইসলামই বাংলা ভাষায় প্রথম কবি, যিনি প্রবল আবেগে এবং অত্যন্ত স্বচ্ছতায় মুসলমানদের জীবন ও বিশ্বাসকে কবিতার বিষয়বস্তু করেছেন এবং অন্তর্নিহিত আবেগে রূপান্তরিত করেছেন। কবির হাতে এ ব্যবহারটি ঘটেছে বিচিত্র প্রকরণে এবং নানা পদ্ধতিতে।

নজরুল পূর্ববর্তী তিন কবি – কায়কোবাদ, সিরাজী ও মোজাম্মেল হকের মতো বিষয় ও শব্দ ব্যবহারে দ্বিধাগ্রস্ততা ও অনুকরণ পদ্ধতিকে অস্বীকার করেই নিজের ইচ্ছা এবং এক প্রকার স্বেচ্ছাচারিতার সম্মোহনে বাংলা কবিতাকে 'নিজের মত করে তৈরী করলেন।' সবচে বড় কথা, 'তাঁর কবিতার গতিবিধি, সুর ঝংকার, বলিষ্ঠ আবেগ এবং দৃপ্ত প্রবাহ হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলের জন্যই গ্রহণীয় হয়েছিল। এমন একটি ছন্দের হিল্লোল তিনি নির্মাণ করেছিলেন যা পাঠককে অভিভূত করে এবং সম্মুখের দিকে নির্দ্বিধায় নিয়ে যায়'। *অগ্নি-বীণার* "প্রলয়োল্লাস", "বিদ্রোহী", "কামাল পাশা", "আনোয়ার পাশা", "কোরবাণী", "খেয়াপারের তরণী", "মহররম" প্রভৃতি কবিতায় ক্ষিপ্রতা, ঋজুতা, নাটকীয়তা – সর্বোপরি বিশ্বাসের দৃঢ়তা এক অতুলনীয় আবহের সৃষ্টি করেছে। ধ্বনিগত সুসাম্য বা স্বরসাদৃশ্য এসেছে বিস্ময়করভাবে। তাঁর জটিল সুফী মতবাদও পেয়েছে গ্রহণযোগ্যতা। প্রবন্ধকারের মতে, একজন শুদ্ধচিত্ত বিশ্বাসী মুসলমান হিসেবে নজরুল ইসলাম মহানবীর জীবনী-কাব্য রচনা করেন। ইসলামী প্রসঙ্গের ক্ষেত্রে নজরুল ইসলাম সততাসিদ্ধ, আবেগময় এবং পরিপূর্ণভাবে আত্মনিবেদিত। এক্ষেত্রে তিনি নিজেই নিজের তুলনা।

বিষয়গত সাজুয্যের কারণে আমরা পরবর্তী প্রবন্ধটি বেছে নিচ্ছি আলোচনার জন্যে যদিও তালিকার মধ্যে এর স্থান অষ্টম। প্রবন্ধটির নাম : "ইসলাম ও নজরুল ইসলাম : একটি সমীক্ষা।" এটি সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিত থেকে প্রস্তাবিত। ধর্মীয় সত্তা সম্পর্কে প্রাথমিক আলোচনা প্রসঙ্গে সৈয়দ আলী আহসান যথার্থ ধর্ম-বিশ্লেষকের মতো মন্তব্য করেন :

> ইসলাম ধর্মকে জীবন থেকে বিশ্লিষ্ট করে গ্রহণ করে না। ইসলামে ধর্ম একটি আদর্শিক এবং আলৌকিক কোন প্রজ্ঞার বিভূষণ নয়। ইসলাম মানুষের সর্বমুহূর্তের কর্মপ্রবাহের একটি শুভ এবং সমর্থক শক্তি।
>
> ... বাংলা কাব্যক্ষেত্রে নজরুল ইসলাম প্রথম কবি যিনি ইসলামকে পরিপূর্ণভাবে তাঁর কবিতায় রূপ দেবার চেষ্টা করেছিলেন।

অগ্নিবীণা'র কবিতাগুলোর কিছু ভিন্ন বিশ্লেষণ শেষে পাই তাঁর অভিমত :

> যে সমস্ত কবিতায় ইসলামের কথা নেই, যে সমস্ত কবিতায়ও মানুষের কথা আছে এবং দুঃখ ও দুর্দশার অপনোদনের কথা আছে। (তবে) নজরুল ইসলামকে যর্থার্থভাবে বিচার করতে গেলে তাঁর কবিতার ইসলামী প্রেক্ষাপটটি উন্মোচন করতে হবে।

বিষের বাঁশী কাব্যগ্রন্থের "ফাতেহা-ই-দোয়াজদহম"-কে অধ্যাপক আহসান একটি অসাধারণ প্রশান্তিসূচক কবিতা মনে করেন এবং মন্তব্য করেন :

> একজন যথার্থ বিশ্বাসী মুসলমানের কাছে রাসুল হচ্ছেন তার সর্বাপেক্ষা প্রিয়তম মানুষ। রাসুলকে গ্রহণ করবার মধ্য দিয়ে সে যেমন সংসারে শান্তি পায়, তেমনি বেদনায় ধৈর্য পায় এবং অবশেষে আল্লাহর প্রতি নিবেদিত হবার ক্ষমতা অর্জন করে। নজরুল ইসলাম এই কবিতার মধ্য দিয়ে রাসূল-প্রেমিক হিসেবে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছেন।

জিঞ্জীর (১৩৩৯) কাব্যগ্রন্থের "খালেদ"ও এসেছে তাঁর আলোচনায়। এসেছে ইসলামী গানের বই *জুলফিকার* (১৩৩৯)-যার গান-গজল অদ্যাবধি জনপ্রিয়। *নতুন চাঁদ* থেকে দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে কাজী নজরুল ইসলাম মুসলমানদের অন্তরঙ্গ বিশ্বাস ও আবেগকে কী পরিমাণ উদ্দীপ্ত করেছেন তা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন।

ক্রমানুসারে তৃতীয় হলেও "নজরুল ইসলাম : একটি নতুন বিবেচনা" সম্ভবত তাঁর সর্বশেষ নজরুল বিষয়ক রচনা (রচনাকাল মে, ১৯৯৯)। গোড়াতে তিনি প্রাচীন যুগ থেকে বাংলা কবিতার অভিব্যক্তিগত পার্থক্যের মৌলিক বিশিষ্টতা নির্ণয় করবার প্রয়াস পেয়েছেন। প্রথাগত বিদ্যার অধিকার অধিক লাভ না করেও নজরুল তাঁর প্রথমদিকের রচনা "বিদ্রোহী"তেই প্রমাণ করলেন যে তাঁর জানার পরিধি 'বিস্ময়করভাবে বিস্তৃত'। যা শুনেছেন, যা পড়েছেন নজরুল তাই 'প্রজ্ঞা ও বুদ্ধির সাহায্যে' ব্যবহার করেছেন অবলীলাক্রমে।' "মোর প্রিয়া হবে এস রাণী" গানটির কথা উল্লেখ করে তিনি দেখিয়েছেন যে ইয়েট্‌স অনুসরণে রবীন্দ্রনাথ (তাঁর গান "ওগো বধু সুন্দরী, তুমি মধু মঞ্জুরী" তুলনীয়) ও নজরুল উভয়েই কী অতুলনীয় কল্পনা-বিলাস দেখিয়েছেন। অতঃপর সুফীদর্শন ও বৈষ্ণব রূপাভিব্যক্তির গভীরে প্রবেশ করে নজরুল যেমন প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছেন, তেমনি আভাস দিয়েছেন সাধনার অভ্যন্তরে আত্মবিলুপ্তির। উপসংহারে তাঁর উল্লেখযোগ্য মন্তব্য :

নজরুল ইসলাম বাংলা কবিতার ধারাক্রমকে লক্ষ্য করে আবেগের সম্ভাষণ যেমন এনেছেন, তেমনি প্রজ্ঞার বিভূষণ দ্বারা কাব্যকে সুশোভিত করেছেন। আবার ধর্মীয় চৈতন্যের বিনম্র সমর্থনও কবিতায় স্পষ্ট করেছেন। এভাবেই নজরুল ইসলামকে আমরা পাই বাংলা কাব্য ধারায়। বাংলা কাব্যধারার স্রোতে তিনি যেমন একজন ভাসমান পুরুষ, তেমনি আবেগে এবং উচ্ছ্বলতায় একজন অসাধারণ দীপ্ত পুরুষ। নজরুল ইসলাম স্বাভাবিক চৈতন্যের অধিকারী একজন কবি নন, তিনি বলিষ্ঠ প্রজ্ঞার অধিকারী হয়ে একজন অসাধারণ চৈতন্যলোকের কবিকণ্ঠ।

"*বুলবুল*-কাব্যের ব্যথা এবং কামনা" শীর্ষক পরবর্তী প্রবন্ধে অধ্যাপক আহসান আমাদের জানান, 'প্রেম অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কবিতা ও গানের একটি বিষয়' তাছাড়া কবির কাছে

> প্রেম হচ্ছে, এক ধরনের মানসিক অনুভূতি সেখানে কবি না-পাবার বেদনাকে এবং পেয়েও হারাবার শংকায় এক ধরনের দুঃখের অনুভূতিতে জেগে উঠেন।

বুলবুল কাব্যপাঠে তাঁর এবং ভূমিকায় শ্রীঅমলেন্দু দাশগুপ্তর ইয়েটস রচিত প্রেমের কবিতার কথা মনে পড়ে গেল। অধ্যাপক আহসান বলেন,

> যেমন ইয়েটসের ক্ষেত্রে তেমনি নজরুল ইসলামের ক্ষেত্রেও প্রেম দিয়ে একটি কল্পলোক এবং স্বপ্নলোক নির্মাণ করা হয়েছে, ... *বুলবুল* কাব্যগীতিকার সবগুলো গান স্বপ্নলোকের এবং চেতন-অচেতনতার মোহনীয় মুহূর্তের। একটি গানের একটি স্তবক নিম্নে উদ্ধৃত করছি :
>
> এত জল ও-কাজল-চোখে
> পাষাণী, আনলে বল কে।
> টলমল জল-মোতির মালা
> দুলিছে ঝালর-পলকে।

কীট্‌স কথিত কাল্পনিক বেদনাবোধ একসময় বিহারীলাল এবং রবীন্দ্রনাথের প্রথমদিকের কবিতা ও গানে লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু, 'নজরুল ইসলামের মধ্যে কাল্পনিক প্রেমের বিরহজনিত দুঃখবোধ একটি নতুন স্বাদ নিয়ে অবস্থিত হয়েছে'। তাছাড়া নতুন সুরের সম্মোহনে নজরুল প্রেমের আকুলতাকে ব্যক্ত করেছেন। উদাহরণ, পিলু রাগের বিখ্যাত গানটি :

'ভুলি কেমনে, আজো যে মনে বেদনা সনে রহিল আঁকা।'

তাছাড়া, তাঁর মতে, '*বুলবুলের* গানগুলোর ক্ষেত্রে নজরুল ইসলাম বাংলাদেশের প্রকৃতিকে নানা বিচিত্র শোভনীয় রূপে ব্যবহার করেছেন।'

"গানের আহত পাখি" রচনাটিতে সৈয়দ আলী আহসান যেন জোর দিয়েই বলতে চান,

> নজরুল ইসলাম তাঁর প্রেমের কবিতায় শুধু প্রেমের বেদনাকেই আমাদের অনুভবের মধ্যে আনতে চেয়েছেন। তাঁর প্রেমচিন্তা যথার্থ, পার্থিব যুবক-যুবতীর প্রেমচিন্তা, যেখানে সবুজ পাতার শিহরণ আছে, বাতাসের স্পর্শের আশ্বস্ততা আছে, পাখির কলকণ্ঠ আছে, পুষ্পের সৌরভ আছে এবং নদীর স্বচ্ছ প্রবাহ আছে। নজরুল ইসলাম প্রেমকে কখনও অলৌকিক করেননি, তাঁর কাছে প্রেম হচ্ছে মানুষের যৌবন উন্মাদনার একটি অস্তিত্ব।

প্রেমের কল্পনায় যেমন, তেমনি, 'গানের শব্দ বিন্যাস এবং সুরের বিস্তারে' এমন একটি সহজাত এবং স্বাভাবিকতা আছে, যা আমরা পাই প্রকৃতিতে। তাঁর মতে :

> নজরুল ইসলাম প্রেমকে একটি বিশ্বাস এবং বিস্ময়কর অনুভূতিতে রূপান্তরিত করেছিলেন। ... তিনি একটি মমতার ইচ্ছার মানুষ। মানুষের জীবনে মমতা এবং ইচ্ছার কোন সময়কাল নেই, কোন দেশকাল নেই, কিন্তু তার আন্তরিক অভিপ্রায়ের একটি চিরকালীনতা আছে। ... নজরুল ইসলামের প্রেমের গানগুলো চিরকাল 'আধুনিক'।

সুরসাকী কাব্যগীতি থেকে দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে অধ্যাপক আহসান বোঝাতে চেয়েছেন যে, 'প্রেমিক নজরুল ইসলাম একটি অখন্ড সত্তা। যেখানে মধুর অভিপ্রায় আছে। বিরহের কাতরতা এবং দূরে-বহুদূরে উড়ে যাবার বাসনা আছে।' নজরুলের গানগুলো যেন আহত পাখির মত প্রিয়তমার পায়ে লুটিয়ে পড়ে। সুরের পাখায় এ গানগুলো যখন আকাশে উড়ছিল তখন প্রেমিকার নয়নের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ তীর হয়ে তার প্রেমিকাকে আহত করে। তার মৃত্যু আহত কণ্ঠে তখন গানের বন্যা জাগল এবং মৃত্যুর বিষাদের মধ্যে অমৃতের স্বাদ আলোচনার ধারাবাহিকতায় আমরা এখন বিবেচনা করব "নজরুলের সুরের জগৎ" নিবন্ধটি। লেখক গোড়াতেই ঘোষণা করেছেন যে তিনি নজরুল ইসলামের সুরের বৈচিত্র্য কিংবা রাগ-রাগিণীর তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করবেন না। তিনি তাঁর গানের বিশিষ্টতা

ও অনন্যতা কোথায় তার কারণ অনুসন্ধান করবেন। প্রথমত রবীন্দ্রনাথের বিষয়টি এল। সৈয়দ আলী আহসান মনে করেন, 'রবীন্দ্রনাথের গানে প্রধানত কথার মাধুর্য বেশি। ... বাণীর সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে তিনি তাতে সুরও দিয়েছেন।' যেটি কবিতাতেও আরোপিত হতে পারে এবং গ্রহণযোগ্যতা লাভ করতে পারে। নজরুলের কিছু কিছু গানে এরকম 'কথা ও সুর একই মাত্রায় পরস্পর পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নজরুল ইসলামের গান সুরের ব্যঞ্জনায় শব্দকে গ্রহণ করেছে। শব্দের তাৎপর্যে সুর এসে উপস্থিত হয়নি। ইউরোপের শিল্পীগণের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে তিনি 'গ্রহ-নক্ষত্রের সংগীত', চিত্রকর্মে বস্তুর বিমূর্ততা ব্যাখ্যা করেন এবং কবিতা ও গানের মৌল পার্থক্য নির্ণয়ের প্রয়াস পান। তাঁর মতে, 'বাণীর রহস্য নিয়েই কবিতার যত বিচিত্র খেলা। কিন্তু সংগীতে কি তাই? সংগীতের প্রয়োজন কেন? সংগীতের প্রয়োজন হল– মানব জীবনে বিশ্বাস এবং আনন্দের এমন একটি রহস্য উদঘাটন করা যে রহস্যের মাধ্যমে আমরা অলৌকিককে সফল করতে সক্ষম হবো। এখানে ধ্রুপদী সংগীতের প্রসঙ্গ আসে, কিন্তু সেখানে 'সুরেরই প্রতাপ, বাণীর নয়'। অধ্যাপক আহসান তাঁর বক্তব্যের স্বপক্ষে নজরুলের তিনটি গান উদ্ধৃত করেন এবং এই বলে উপসংহার টানেন যে :

> বাংলা গানের ভুবনে এক সময় দ্বিজেন্দ্রলাল এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে এসেছিলেন অতুলপ্রসাদ এবং একটু পরে রজনীকান্ত সেন। তারপর এলেন রবীন্দ্রনাথ এবং সবার শেষে নজরুল ইসলাম। সবার শেষে এলেও তাঁর স্থান সর্বশেষে নয়। হয়তোবা সবার উপরেই। বাংলা গানের ভুবনের সকল অধিকর্তাই নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে অনন্য, কাউকে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু নজরুল ইসলামকে যখন গ্রহণ করি তখন তাঁকে তাঁর বাণীর শক্তিতে গ্রহণ করি না, তাঁকে গ্রহণ করি তাঁর সুরের মেখলায়, মাধুর্যে এবং তাৎপর্যে। বাস্তবিক সুরকে এমন বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ করে অলৌকিককে স্পর্শ করবার যে স্পর্ধা নজরুল ইসলাম দেখিয়েছেন তার তুলনা হয় না।

"আমি এবং নজরুল ইসলাম" স্বাভাবিকভাবেই একটি স্মৃতিচারণমূলক আলেখ্য। তবে এখানে ব্যক্তির চেয়ে আবহের, বিশ দশকের শেষ দিক থেকে সাম্প্রতিককালের সাংস্কৃতিক পরিবেশ ও পরিস্থিতি মূল্যায়ণের অবকাশ ঘটেছে অন্তরঙ্গ পটভূমিতে। উল্লেখ্য যে, ১৯৭৪ সালে বাংলা একাডেমীর সাহিত্য সম্মেলনে অধ্যাপক আহসান কাজী নজরুল ইসলামের

সঙ্গে মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন এক অনুষ্ঠানে, সে প্রসঙ্গ এখানে উত্থাপিত হয়নি।

গ্রন্থশেষের প্রবন্ধ "নজরুল ইসলামের সমসাময়িক কবিগণ" সংক্ষেপে রবীন্দ্র পরবর্তী কবিদের মধ্যে সত্যেন দত্ত, কামিনী রায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, করুণা নিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, কালিদাস রায়, যতীন্দ্রনাথ বাগচী, যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত গীতিকারদের মধ্যে অতুলপ্রসাদ সেন ও রজনীকান্ত সেন এবং মুসলমান কবিদের মধ্যে গোলাম মোস্তফা, শাহাদাৎ হোসেন, জসীম উদ্দীন, বন্দে আলী মিয়া এবং বেনজীর আহমদ, ভিন্নমাত্রার কবি। জীবনানন্দ দাশ এবং প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রসঙ্গও উত্থাপিত হয়েছে।

উপসংহারে পাই সাহিত্যের ইতিহাসকারের, ভূমিকায় অধ্যাপক আহসানের মন্তব্য :

> একটি কথা বোধ হয় নিশ্চিন্ত হয়ে বলা যায় যে, আধুনিক বাংলা কাব্য-জগতের প্রথম তাৎপর্যবহ পুরুষ হচ্ছেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত, তারপরে এসেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং আধুনিকতার এই ধারাক্রমের মধ্যে সর্বশেষ ব্যক্তিসত্তা হচ্ছেন কাজী নজরুল ইসলাম। এই তিনজনের পর নতুন কোন নামের স্পন্দন এখনও আমরা অনুভব করছি না। এরা তিনজনই সত্তায়, নিজস্ব বৈভবে এবং নিজস্ব অননুকরণীয় পদ্ধতিতে বাংলা কাব্য-জগৎকে প্রভাবিত করে রেখেছেন।

দেখা যাচ্ছে, জীবনের শেষ প্রান্তে এসে সৈয়দ আলী আহসান নজরুল প্রতিভার নব মূল্যায়নে অগ্রণী হয়েছেন – কবিতা ও গানের প্রশংসনীয় দিককে যেমন তুলে ধরেছেন তেমনি তাঁর অধ্যাত্ম-সাধনা এবং সুর সৃজনের সংগুপ্ত দিককেও উন্মোচিত করেছেন। উপর্যুক্ত ন'টি প্রবন্ধ তিনি একটি গ্রন্থে প্রকাশের জন্য রেখে গেছেন। কিন্তু সংশোধন/সম্পাদনার কাজটি করে যেতে পারেনটি। তাঁর আরেকটি রচনা অসমাপ্ত আকারে পাওয়া যাচ্ছে – আসলে অসমাপ্ত নয়, সম্ভবত দু'টি পাতা ছুট অবস্থায় পান্ডুলিপি আমাদের হস্তগত হয়েছে। রচনাটির নাম "ফিরোজা বেগমের কণ্ঠে নজরুল গীতি"। ফিরোজা বেগম বর্তমানে কিংবদন্তী স্বরূপ সংগীতশিল্পী। দীর্ঘকাল তিনি মূলত নজরুল ইসলামের গানই গেয়েছেন রেকর্ডে রেডিও এবং টেলিভিশনে। আমি তাঁকে মিশরের উম্মে কুলসুম, আমেরিকার এলা ফিটজ্‌গেরাল্ড, পর্তুগালের আমালিয়া রদ্রিগেজ ও ফ্রান্সের এদিৎ পিয়াফ প্রমুখ আন্তর্জাতিক খ্যাতিনাম্নী গায়িকাদের সমকক্ষ মনে করি। অধ্যাপক

আহসানের মতে, 'ফিরোজা বেগম নজরুলের গান উপস্থাপনায় এক তুলনাবিরল অনুপম মাধুর্যলোক নির্মাণ করেন। এবং তাঁর কণ্ঠের মাদকতা অদ্যাবধি অক্ষুণ্ন রেখেছেন।' তাছাড়া অপসংগীতের প্রচারণা'র যুগে ফিরোজা বেগম আমাদের সংগীতের সত্তাকে রক্ষা করেছেন।' সৈয়দ আলী আহসান আরও লক্ষ্য করেছেন, 'তাঁর নিজস্ব গায়কী পদ্ধতিতে, নজরুল সংগীতের বিশ্লেষণাত্মক উপস্থাপনা বিদ্যমান এবং আমাদের সমূহ আগ্রহ জাগ্রত রেখে এমন একটি সুর-সংগীত সঙ্গতির পরিবেশ নির্মাণ করেন যার মধ্যে আমরা বিনম্র মগ্নতা পাই, তন্ময়তা পাই এবং কিছু বিরল স্বর-বিন্যাস পাই। তাছাড়া তাঁর ইসলামী গানও আর্তি এবং নিবেদনের মহিমায় চিত্তহারী।'

উপসংহারে আমাদের মন্তব্য : প্রায় অর্ধশতাব্দীর পরিসরে নজরুল অধ্যয়নে মগ্ন থেকে সৈয়দ আলী আহসান আমাদের জন্য রেখে গেছেন এক অনন্য উত্তরাধিকার। শুরুতে 'নিকষে সোনার রেখা' দেখতে গিয়ে অন্য অনেকের মতো কিছু 'কটু কথা' তিনি হয়তো বলেছেন, কাজী নজরুল ইসলাম স্বয়ং "আমার কৈফিয়ত" কবিতায় যার অপ্রিয় উত্তরও দিয়ে গিয়েছিলেন। তবে অধ্যাপকের ব্যক্তিগত অনুরাগ, অনুসন্ধান ও প্রজ্ঞা তাঁকে নজরুলকে নতুন করে আবিষ্কারে প্রাণিত করেছে। অবশ্যই তিনি তখন কাজী নজরুল ইসলামের অসাধারণত্বকে প্রমাণিত পেয়েছেন এবং তাঁর বিশিষ্ট দৃষ্টিতে 'ঘাসের সবুজে ... আকাশের নীলকে' প্রত্যক্ষ করেছেন।

মুক্তিযুদ্ধের অনন্য কণ্ঠস্বর

বহুমাত্রিক বৈচিত্র্যে যে মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হল ১৯৭১ সালে, তার অনন্য কণ্ঠস্বর তথা ব্যতিক্রমী প্রবক্তা হলেন সৈয়দ আলী আহসান। ঢাকায় বাংলা একাডেমী পরিচালনার গৌরবময় অধ্যায়ের অবসানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম ডীন-এর দায়িত্ব শেষ করে তিনি তখন বাংলা বিভাগের প্রফেসর ও প্রধান। মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকে শেষ পর্ব অবধি তাঁর অত্যুজ্জ্বল ভূমিকা যেমন যথাসময়ে যথোপযুক্ত স্বীকৃতি লাভ করেছে, তেমনি অস্বীকৃতির অপপ্রয়াস কিংবা তথ্যবিকৃতির দুর্ভোগও তাঁকে পোহাতে হয়েছে বারংবার। অতি সফল মহৎ জীবনের এ এক অতি সরলীকৃত বিড়ম্বনা বটে।

সৈয়দ আলী আহসান তাঁর একটি আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থে মুক্তিযুদ্ধে সম্পৃক্ত হবার কাহিনী মোটামুটি বিস্তৃতভাবে, প্রমাণিত দলিলপত্র এবং সর্বোপরি গভীর দার্শনিকতার উপাদানসহ লিপিবদ্ধ করেছেন। বইটির নাম *'যখন সময় এল'* (১৯৯২)। সেই মহাগ্রন্থ পাঠ এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই আলোচনায় আমরা সংক্ষেপে তাঁর অনন্য কণ্ঠস্বর হবার বিচিত্র অথচ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাবলী তুলে ধরতে প্রয়াস পাবো। প্রথমে আমরা জানতে চাইবো তাঁর অভিপ্রায়ের কথা; তিনি লিখেছেন :

> আমার কাছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ছিল শুভ এবং কল্যাণ প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। আমি সব সময় ভেবেছি বাংলাদেশের মানুষ হিসেবে আমার নিজস্ব সত্তার বিকাশের প্রয়োজন রয়েছে। আমার ভাষা এবং ধ্বনি বিনিময়, আমার বিবিধ ইচ্ছা এবং সংকল্প এবং আনন্দের সবকিছুকে আবিষ্কার করতে হলে আমার নিজস্ব এবং স্বাধীন ভূ-কেন্দ্রের প্রয়োজন। আমার কাছে মুক্তিযুদ্ধের অর্থ ছিল আমার নিজস্ব সত্তাকে আবিষ্কার করার ইচ্ছা। আমি এই ইচ্ছাকে রূপ দেবার সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে যে সক্ষম হয়ে ছিলাম এখানেই আমার গর্ব এবং অহংকার। (পৃঃ ৭)

কিন্তু কীভাবে কার্যকর করলেন তাঁর অভিপ্রায়? শুধু কথা আর কথা দিয়ে। কিন্তু সেদিন সে কথার শব্দসম্ভার উচ্চারণ-সব ছিল অনুপম, প্রায় তুলনারহিত। তিনি নিজেই বলেছেন :

মুক্তিযুদ্ধের সময় মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে আমি অনবরত কথা বলেছি, বক্তৃতা করেছি। শব্দই ছিল আমার অস্ত্র। এ অস্ত্রের তুলনা হয় না। চিত্তের সকল ইচ্ছা এবং বিশ্বাসের সারাৎসার শব্দে সমর্পণ করে আমি আমার দেশের স্বাধীনতাকে প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছিলাম। (ঐ)

বাংলা নববর্ষের দিনে দেশত্যাগ করে তাকে সপরিবারে যেতে হয়েছে আগরতলায়। দেশী-বিদেশী বহু ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্বের মুখোমুখি হয়ে কর্মব্যস্ত দিন অতিবাহিত হলেও আমন্ত্রিত অতিথিরূপে তিনি সেখানে বক্তৃতা করেছিলেন দু'টি কি-তিনটি অনুষ্ঠানে। সেগুলো প্রশংসিতও হয়েছিল, কিন্তু তাঁকে দেখে মনে হত ভয়ানক দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। তবে অল্প ক'দিনের মধ্যে তিনি লিখলেন, "আমার প্রতিদিনের শব্দ" কবিতাটি। মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে প্রথম ভাবগম্ভীর অনবদ্য রচনা। আমরা ক'জন পারিবারিক সদস্য ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকর্মী তাঁর অনন্য কণ্ঠস্বরে কবিতাটি শুনলাম। কবিতাপাঠের পর তাঁকে প্রথম সংগ্রাম বিজয়ী যোদ্ধার মতো উৎফুল্ল দেখা গেল।

এরপর এলো কলকাতা পর্ব। দ্বিতীয় দিনে তিনি আশ্রয় লাভ করলেন ব্যারিস্টার সালামের এপার্টমেন্টে। একটি নাতিবৃহৎ কক্ষে পাশাপাশি চারটি বিছানা ব্যারিস্টার মওদুদ, সাদেক খান, সুবিদ আলী (এমপিএ) ও তাঁর। সমাদর সত্ত্বেও তাঁর মুখ কালো। সম্ভবত সেজন্য আমরা দু'জন যখন বাংলাদেশ মিশনে হোসেন আলী সকাশে যাচ্ছি তখন করিডরে দেখা হল সহপাঠী জহির রায়হানের সঙ্গে। আমাকে একান্তে ডেকে জহির বললো : 'দ্যাখো, স্যারের যেন কোন অসুবিধা না হয়। প্রয়োজনে আমাকে খবর দেবে।' এই বলে টেলিফোন নম্বরসহ একটি ঠিকানা সে আমাকে দিল। পরিবার পরিজন আগরতলায়, 'অর্থনৈতিক দুর্বহতা' সার্বিক অনিশ্চয়তা নিশ্চয়ই তাঁকে ভয়ংকর মানসিক চাপে রেখেছিল। এরমধ্যে *দেশ* পত্রিকার অফিসে সাগরময় ঘোষ, গৌরকিশোর ঘোষ, আকাশবাণী কেন্দ্রে দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রণবেশ সেন, হিন্দুস্থান পার্কে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, যোধপুর পার্কে অন্নদা শংকর রায়, পার্ক সার্কাসে আবু সায়ীদ আইয়ুব ও জাস্টিস এস এ মাসুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ তাঁকে অনেকটা সজীব ও বাকমুখর করে তুলল। কিন্তু মন-মানসিকতা যথার্থভাবে চাঙ্গা হল বম্বে থেকে এ বি শাহ এলে। শাহ এসেছিলেন প্যারিস থেকে আন্তর্জাতিক পিইএন প্রেসিডেন্ট প্রখ্যাত ফরাশি কবি পিয়ের এমানুয়েল, ফোর্ড ফাউন্ডেশনের শেফার্ড প্রমুখের নির্দেশে। সৈয়দ সাহেব আগরতলা অবস্থানকালেই তাঁদের সঙ্গে

যোগাযোগ স্থাপনে সমর্থ হয়েছিলেন। এ সম্পর্কে তিনি পরবর্তীকালে লিখেছেন :

বাংলাদেশের যে সমস্ত বুদ্ধিজীবী কলকাতায় অবস্থান করছিলেন তাঁদের জীবনধারণের উপায় সন্ধানের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে চেষ্টা করেছি। এর ফলে বাংলাদেশের শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবীদের ১১০ জনকে মুক্তিযুদ্ধের সমাপ্তি পর্যন্ত মাসিক ভাতা দেয়া সম্ভবপর হয়েছিল। (পৃঃ ৮)

কলকাতায় অনেকেই আমাদের আশ্বাস দিয়ে ছিলেন যে, আমাদের জন্য একটা কিছু হচ্ছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছু হয়নি। অর্থাৎ অনেকের জন্যই হয়নি। অর্থনৈতিক সাহায্যের বহু আশ্বাস পাওয়া গেলেও উপযুক্ত সাহায্য কখনো আসেনি। কেউ কেউ ব্যক্তিগত পর্যায়ে বিকল্প ব্যবস্থাধীনে কিছুটা সুবিধা হয়তো পেয়েছে। তবে সৈয়দ আলী আহসানের ব্যক্তিগত প্রয়াসটি সমষ্টিগতভাবে খুবই ফলপ্রসূ হয়েছিল বলে তাঁর এবং আমার বিশ্বাস।

যখন সময় এল গ্রন্থে বর্ণিত হয়নি অনেক ঘটনার মধ্যে প্রথম সর্বাপেক্ষা উল্লেযোগ্য হল রবীন্দ্রসদনে পশ্চিমবঙ্গের বুদ্ধিজীবীদের সম্মিলিত বাংলাদেশ সহায়ক সমিতির বিশেষ অনুষ্ঠানে সৈয়দ আলী আহসানের প্রধান অতিথি হওয়া। আমি আসন অলংকৃত করা লিখছি না কারণ মঞ্চে কোন আসনই ছিল না। আমরা এক সঙ্গে গিয়ে প্রথম সারিতে বসেছিলাম। পাশেই ছিলেন শওকত ওসমান, জহির রায়হান, ড. রমা চট্টোপাধ্যায়সহ চেনা-অচেনা অনেকে। সম্ভবত সেটি একটি বিচিত্রানুষ্ঠান ছিল আয়োজক ও মোটা টাকা চাঁদা দানকারীদের জন্য। অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন চিত্রনায়িকা কবরী ও অভিনেতা ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায়। এক পর্যায়ে সৈয়দ আলী সাহেবকে ডেকে নিয়ে অন্ধকার মঞ্চে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা শুরু করতে দেখা গেল। প্রথম দিকে মনে হল ওপার বাংলার লোক-চেহারা, পোশাক ইত্যাদিতে অপরিচিত এই ব্যক্তির কাছ থেকে এমন কী শুনবে – এই মানসিকতা নিয়ে বসেছিলেন। কিন্তু তিন-চার মিনিটের মধ্যে বিশাল সভাগৃহ সচকিত হয়ে গেল : এ কী অনন্য কণ্ঠস্বর! এ কী সুললিত ভাষণ, অশ্রুতপূর্ব বক্তব্য! বহুক্ষণ একেবারে পিনপতন নিস্তব্ধতা। তারপর কিছু বয়স্ক লোকের বিশেষ করে মহিলার ধ্রুপদী সঙ্গীতের সঙ্গে উচ্চারিত প্রশংসাসূচক 'আহ', 'উহু' ধ্বনি শোনা গেল। আধঘন্টার মতো বক্তৃতা শেষে সে কী করতালি!

কথা না বাড়িয়ে এখানে বলা যেতে পারে যে, তাঁর বা অন্য কারুর এত সুন্দর বক্তৃতা আমি নিজেই কখনো শুনেছি কিনা সন্দেহ। যাহোক, পরদিন দেখলাম তিনি অসম্ভব আনন্দিত, তৃপ্ত এবং প্রত্যয়দীপ্ত। এরপর তাঁকে আর ফিরে তাকাতে হয়নি, যদিও সমস্যা ছিল অফুরান, কিন্তু আমার অন্তত মনে হল যে, তিনি যেন কলকাতা জয় করলেন। তাঁর পরবর্তী অসাধারণ বক্তৃতার সময় আমি সেখানে ছিলাম না, সেটি হল বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলনে যা অনুষ্ঠিত হল কলকাতায় ২৯শে আগস্ট। সে অনুষ্ঠানে সভাপতি এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন, যথাক্রমে অশোককুমার সরকার এবং অম্লান দত্ত। প্রধান অতিথি রূপে সৈয়দ আলী আহসান সম্মেলন উদ্বোধন করেছিলেন। *আনন্দবাজার পত্রিকার* ৩১শে আগস্ট সংখ্যায় উক্ত অনুষ্ঠানের বিবরণ ও বক্তৃতার উদ্ধৃতি রয়েছে : "তিনি বাংলাদেশের ভাষা ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে নবজাগরণের সূচনা এবং এর প্রবাহধারা বিশ্লেষণ করেন। তিনি বলেন যে, বাংলাদেশের আশা-আকাঙ্খার জয়ও সেরকম অবশ্যম্ভাবী।

(ঐ পৃঃ ৬০-৬৪)"

কলকাতায় অনেক বৈঠকে ও অনুষ্ঠানে বক্তব্য উপস্থাপন ছাড়াও প্রাতিষ্ঠানিক দিক থেকে তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ভাষণ প্রদানের সুযোগ হয়েছিল শান্তিনিকেতনে। বিশ্বভারতীতে সেবার ২২শে শ্রাবণ রবীন্দ্র তিরোধান দিবসে তাঁকে প্রধান অতিথিরূপে আমন্ত্রণ জানান হয়। সেখানকার সুপ্রবীণ অধ্যাপক ও প্রাজ্ঞপুরুষ প্রবোধচন্দ্র সেনের উদ্যোগে এটি সম্ভবপর হয়। শোনা যায়, বাংলাদেশের কোন বুদ্ধিজীবী সময় ও অর্থ ব্যয় করে শান্তিনিকেতনে গিয়ে এটি যেন না ঘটে তা বলতে গিয়েছিল। কিন্তু তা যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং তিনি রবীন্দ্র প্রসঙ্গে এক চমৎকার ভাষণ উপস্থাপন করে আসেন। সেখানে তিনি সস্ত্রীক রতন কুঠির এক নম্বর কক্ষে অবস্থান করেছিলেন কয়েকদিন। এর সাত বছর পর আমিও সস্ত্রীক শান্তিনিকেতনে গিয়ে একই কক্ষে থাকি এবং প্রবোধ সেনের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতের সুযোগ লাভ করি।

কলকাতার বাইরে মুক্তিযুদ্ধের এই অনন্য প্রবক্তা তিনবার বক্তৃতার উদ্দেশ্যে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে ভ্রমণ করেন। প্রথমবার তিনি যান বাঙ্গালোর। সেখানকার 'গান্ধী স্মারকনিধি' নামক একটি প্রতিষ্ঠান তাঁকে আমন্ত্রণ জানায়। ২৩শে জুলাই বিকেল ৩টায় তিনি বিমানে বাঙ্গালোর পৌছান এবং সাড়ে পাঁচটায় ন্যাশনাল কলেজের অডিটরিয়ামে বাংলাদেশের ওপর একটি বক্তৃতা দেন। পরদিন সকাল ১০টায় গান্ধীভবনে একটি প্রেস

কনফারেন্সে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন। সেখানে প্রদত্ত তাঁর বক্তব্য ভারতের প্রধান প্রধান সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। বিকেল সাড়ে ৪টায় একটি মহিলা কলেজে এবং সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় কানাড়া সাহিত্য পরিষদে বক্তৃতা করেন। পরদিন সকাল সাড়ে ৯টায় কংগ্রেস এবং ১১টায় ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব ওয়ার্ল্ড কালচার ভবনে তিনি বক্তৃতা করেন। শেষের বক্তৃতাটি ছিল বাংলাদেশের সংস্কৃতি প্রসঙ্গে এবং তাতে বাঙ্গালোরের বিশিষ্ট নাগরিকগণ উপস্থিত ছিলেন। বিকেল ৪টায় 'বিজা এস্টেট' নামক স্থানে একটি বক্তৃতা করেন। এখানে শ্রোতা সংখ্যা ছিল কম এবং শ্রোতাদের অনেকেই হলেন মুসলমান। ২৬ তারিখেও তিনি দুটি বক্তৃতা করেন একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে এবং অন্যটি গান্ধী সাহিত্য সংঘে। ২৭ তারিখ তিনি মহীশুরে যান এবং ইতিহাস প্রধান জায়গাগুলো দেখেন। সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি সংবর্ধনা অনুষ্ঠানেও যোগদান করেন।

এরপর সৈয়দ সাহেব ১ আগস্ট কলকাতায় ইন্দো-সোভিয়েট কালচারেল সোসাইটির অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথিরূপে যোগদান করেন। এতে সভাপতিত্ব করেন নরেন্দ্রনাথ মিত্র। এতে অধ্যাপক আহসান বাংলাদেশের মানুষের জীবন ধারা এবং সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের বিবরণ দিয়ে বলেছিলেন:

> বাংলাদেশের মধ্যযুগের কাব্যে সাধারণ মানুষ অপূর্ব ব্যঞ্জনায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। তাদের কর্ম সাধনার মধ্যে একটি অপূর্ব তৃপ্তি ছিল। তারা জীবনকে গ্রহণ করেছিলো সম্পূর্ণভাবে। বর্তমানকালে অতীতের সেই সাধারণ মানুষকে নতুন করে আবিষ্কার করার প্রয়োজন আছে। (পৃঃ ৮০)

এর একদিন পর গোলপার্কে রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার-এ বাংলাদেশ, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পটভূমি বিষয়ে একটি বক্তৃতা দেন। এতে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর শিক্ষক ড. অমলেন্দু বসু। সেপ্টেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে সৈয়দ সাহেব দিল্লীতে বাংলাদেশ বিষয়ক একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা জয়প্রকাশ নারায়ণ ও অন্যান্য বিষয়ে প্রচুর তথ্য রয়েছে কিন্তু তাঁর নিজের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে তেমন কিছু প্রকাশ করেননি। পরে তিনি ইনস্টিটিউট ফর ইন্ডিয়ান এ্যাফেয়ার্সে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

সেপ্টেম্বর মাসেই তিনি বোম্বে যাবার আমন্ত্রণ পান এবং সেখানে বিশিষ্ট বন্ধুজন সান্নিধ্যে তাঁর সময় কাটে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ

সহায়ক সমিতির কর্মকর্তাদের সঙ্গে তাঁর এই সফর কিছুটা রহস্যজনক। সম্ভবত বড় কোন বক্তৃতা অনুষ্ঠান হয়নি। অর্থ সংগ্রহই ছিল সমিতির লক্ষ্য। অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকটি বক্তৃতার জন্যও তিনি আমন্ত্রণ পান। কিন্তু নানা জটিলতায় শেষ পর্যন্ত তাঁর যাওয়া হয়নি।

কলকাতায় অন্য অনেক কাজকর্মের মধ্যে প্রধান হল বাংলাদেশ আর্কাইভসের প্রতিষ্ঠা। সৈয়দ আলী আহসান পরিচালক রূপে এর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। যুদ্ধ শেষ হলে এর সকল কাগজপত্র ঢাকাস্থ আর্কাইভে জমা দেওয়া হয়। (পৃঃ ৮৫)

অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর আকস্মিক মৃত্যুতে এক শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে তিনি প্যারিসে প্রয়াত পুরনো বন্ধুর স্মৃতিচারণ করে এক মর্মস্পর্শী বক্তৃতা প্রদান করেন। সেখানে বর্তমান লেখকও বক্তৃতা করেন। উল্লেখ্য, ওয়ালীউল্লাহ সাহেবের সঙ্গে আমার প্রায় এক দশকের সম্পর্ক। তাছাড়া আকাশ বাণীর সংবাদে আমার নাম প্রচারিত হলে দেশে আত্মীয়-স্বজনরা জানতে পারেন যে, আমি আরব দেশে মুক্তিযুদ্ধের মিশন শেষ করে কলিকাতায় ফিরেছি।

আরেকটি ক্ষেত্রে সৈয়দ আলী আহসানের মেধা এবং প্রতিভার অকৃত্রিম ও উজ্জ্বল প্রকাশ ঘটেছিল। সেটা হল বেতার ভাষণ। আকাশ বাণীতে তিনি বাংলা ও ইংরেজি কবিতা ও কথিকা পাঠ করেছেন একাধিকবার। কিন্তু নিয়মিত সাপ্তাহিক অনুষ্ঠান হত স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে। অনুষ্ঠানটির নাম 'ইসলামের দৃষ্টিতে'। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন :

> আমি আমার ভাষণে কোরান শরীফ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করতাম যে পাকিস্তান সেনাবাহিনী বাংলাদেশে যে অত্যাচার করছে তা সম্পূর্ণরূপে ইসলাম বিরোধী। তারা নারীদের ওপর অত্যাচার করত, শস্যক্ষেত পুড়িয়ে দিত, এবং ফলবান বৃক্ষকে কর্তন করত। এসমস্ত কিছুই ছিল ইসলামবিরোধী। ... আমার এই ভাষণগুলি খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর দেশে যখন প্রত্যাবর্তন করলাম, তখন আমার ভাষণের প্রশংসা অনেকের মুখে শুনেছি। দুর্যোগের দিনে আমার কথা শুনে দেশের মানুষ স্বস্তি পেয়েছিল।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র মুজিবনগর থেকে অনুষ্ঠানমালা প্রচারের বিভিন্ন সময়ে কর্মকর্তারা তাঁর কাছ থেকে উপদেশ গ্রহণ করত। অনুষ্ঠান প্রচারের সময় দু'বার আমি তার সঙ্গে ছিলাম স্টুডিওর অভ্যন্তরে। সংশ্লিষ্ট

কর্মকর্তার সঙ্গে সবিস্ময়ে লক্ষ্য করেছি লিখিত কোনো টেক্সট বা নোট না দেখে ঘড়ির দিকে না তাকিয়ে তিনি পর পর পাঁচ মিনিটের অনুষ্ঠানের কয়েকটি কথিকা রেকর্ড করে যাচ্ছেন।

উপর্যুক্ত বিবরণ বা বক্তব্যসমূহের দুটো ব্যাখ্যা আমার কাছে আছে। দুটি ব্যাখ্যাই অনেকের কাছে অজানা। প্রথমত সৈয়দ আলী আহসান ছিলেন আবাল্য বাগ্মী। ধামরাইতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কিংবা ঢাকার আরমানিটোলা স্কুলে অধ্যয়নকালেই তিনি উদীয়মান বক্তারূপে সুচিহ্নিত হয়ে গিয়েছিলেন। ধামরাইতে তাঁকে কাঁধে করে বক্তৃতা করানোর জন্য নিয়ে যাওয়া হতো আশেপাশের গ্রামে। অজস্র বই পড়ে দেশ বিদেশের সাহিত্য সংস্কৃতির নানা বিষয়ে জ্ঞানার্জন করে বিবিধ ভাষায় সুললিত ধ্বনি শব্দসম্ভার আহরণ করে তার সুচিন্তিত প্রয়োগে তিনি ক্রমাগত সিদ্ধিলাভ করেন।

দ্বিতীয় ব্যাখাটি হলো তাঁর অংকজ্ঞানের বিষয়। সাহিত্যের ছাত্রদের কাছে যা সাধারণত বিভীষিকা-স্বরূপ, সৈয়দ আলী আহসানের কাছে তা ছিল মজার খেলা। অনেক সাধারণ সমস্যা তিনি অংকের মাধ্যমে সমাধান খুঁজতেন। ডা. কাজী মোতাহার হোসেন অংকের এই মেধাবী ছাত্রকে বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর বিভাগে ভর্তির সুপারিশ করেছিলেন সৈয়দ সাহেবের পিতা সৈয়দ আলী হামেদকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ছাত্র হলেন ইংরেজিতে, ঘটনাচক্রে শিক্ষক হলেন বাংলা বিভাগে। যা হোক, অংকশাস্ত্রের সংহতি ও নিশ্চিতরূপ তাঁর সাহিত্য ভাবনার সাঙ্গীভূত হয়ে পড়ে বলে আমার ধারণা।

যদিও তুলনা সঠিক হবে না, তবু উল্লেখ করা যেতে পারে জাতীয় অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাকের কথা। তিনি সৈয়দ আলী আহসানের প্রিয় শিক্ষক। তাঁর সম্পর্কে সৈয়দ সাহেবের উক্তি :

> একটি প্রত্যয়ের ভঙ্গি তাঁর বক্তব্যে থাকে। তাছাড়া তাঁর বলার ভঙ্গি সবাইকে আনন্দ দেয়। তিনি এমনভাবে কথা বলেন যেন সবকিছু তিনি সুস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন। তাঁর এই নিশ্চিন্ততা এবং প্রত্যয়ী ভঙ্গীর জন্য আমরা সবসময় তাঁর কথা শুনতে ভালবাসতাম। (পৃঃ ১১)।

সম্ভবত সৈয়দ আলী আহসানের নিজের ক্ষেত্রেও তাই। মুক্তিযুদ্ধের অনন্য কণ্ঠস্বররূপে সে সময়কার নাজুক পরিস্থিতিতে এই প্রত্যয়ী ভঙ্গীর কারণে অনেকেই তাঁর কথা শুনতে ভালবাসতেন।

মরণোত্তরকালে প্রকাশিত তিনটি নতুন বই

স্বনামধন্য কবি-শিক্ষাবিদ ও সাংস্কৃতিক মনীষী সৈয়দ আলী আহসান ইন্তে কাল করেছেন চারমাস কম দু'বছর আগে। এর মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে বেশ ক'টি বই, প্রকাশের অপেক্ষায় আছে আরো বেশি, পুর্নমূদ্রণও হয়েছে কয়েকটির। অর্থাৎ বিদগ্ধ ও সমঝদার পাঠকের জন্য রয়েছে এক বিরাট ভোজের আয়োজন-বুদ্ধিবৃত্তিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে তড়িঘড়ি তিনি ক'টি বড় আকারের বই মুদ্রিত দেখতে পেয়ে খুব সন্তুষ্টি লাভ করেছিলেন। বইগুলো হল : *কথাবিচিত্র বিশ্বসাহিত্য* (শিখা), *জীবনের শিলান্যাস* (বাড কমপ্রিন্ট), *শ্রেষ্ঠ কবিতা* (শিকড়)। তাঁর *কবিতা সমগ্র* (শিখা) গ্রন্থটিও ছাপা হয়ে গিয়েছিল। তবে দুই মলাটের মাঝখানে বইটি তিনি হাতে নিতে পেরেছিলেন কিনা, সে বিষয়ে আমি সন্দেহমুক্ত নই। আরেকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ – মার্কিন সংস্কৃতি ও অতলান্ত মহাদেশে ভ্রমণ সম্পর্কিত যা কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লেখকের অন্তর্ধানের পরপরই প্রকাশ করে একটি শোক সভায় শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষা সচিব ও অন্য সুধীজনদের উপহার দেন। বইটির উপর সে সময়ে *ইত্তেফাকের* সাহিত্য পাতায় একটি আলোচনাও ছাপা হয়।

আমাদের সবিশেষ আনন্দের বিষয় এই যে, সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে তাঁর তিনটি নতুন বই। বর্তমান নিবন্ধকার যখন হজ্বব্রত পালনের উদ্দেশ্যে ২৫শে জানুয়ারি থেকে ২রা মার্চ দেশের বাইরে অবস্থান করছেন তখন এগুলি বাজারে আসে। এর মধ্যে একটিকে ঠিক নতুন বই বলা যায় না। বইটি হল, *আল্লাহ আমার প্রভু* (বাতায়ন)। এতে ইতঃপূর্বে প্রকাশিত *আল্লাহর অস্তিত্ব* এবং *হে প্রভু আমি উপস্থিত* শীর্ষক নাতিদীর্ঘ গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয়, দার্শনিক ও সংস্কৃতিক বক্তব্য সম্বলিত পুস্তকদ্বয় (৬৮ পৃঃ ও ৫৬ পৃঃ) সংকলিত। বলা বাহুল্য, দুটি বই-ই একাধিক সংস্করণধন্য।

সৈয়দ আলী আহসান রচিত *ষাট বছর আগের ঢাকা* (বাতায়ন) নানাদিক থেকে একটি মূল্যবান গ্রন্থরূপে বিবেচিত হবে। এটি ৯১ পৃষ্ঠার

একটি স্বল্প পরিসরের ও কমদামের (মূল্য ৬০ টাকা মাত্র) বই। শুধু ঢাকার অতীত কাহিনী নয়, এতে আমাদের সমাজের ভাঙ্গাগড়ার বিস্মৃত বহু তথ্য লেখকের অনবদ্য গদ্যে উপস্থাপিত। সূচিতে আমরা পাই : পূর্বকথন, ঢাকার বৃক্ষশোভা, ঢাকার যানবাহন, ঢাকার পুরনো ঘরবাড়ি, ঢাকার খাবার-দাবার, ঢাকার আনন্দ উৎসব, পুরনো ঢাকায় ভাগ্য-পরীক্ষা, বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত রমণী, প্রাচীন সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবার, বেচারাম দেউড়ির কথা, ঢাকার পুস্তক প্রকাশনা এবং বিপণন, চকবাজারের বইপট্টি প্রভৃতি বারোটি ছোট অধ্যায়ের নাম। বইটি সচিত্র।

যখন কলকাতায় ছিলাম (আহমদ) আপাতত সৈয়দ আলী আহসানের সর্বশেষ প্রকাশনা। যদিও আমরা জানি, তাঁর *বিচিত্র প্রবন্ধ* (গণপ্রকাশনী) দু'খন্ডে বেরুবে খুব শীগগির। শিল্পী কাইয়ুম চৌধূরী এর প্রচ্ছদ এঁকে দিয়েছেন। তাছাড়া, আরও বহু পান্ডুলিপি লেখকের কনিষ্ঠ পুত্র সৈয়দ আলীউল আমিন (ভাইস প্রেসিডেন্ট, সৈয়দ আলী আহসান ফাউন্ডেশন) সাহেবের প্রযোজনায় প্রকাশিত হবে অদূর ভবিষ্যতে।

যখন কলকাতায় ছিলাম শুধু লেখকের নিখাদ স্মৃতিকথা নয়, এতে কলকাতার অন্তরঙ্গ পরিচয়, অনেক প্রখ্যাত শিল্পী-সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের যথার্থ পরিচিতি মূর্ত হয়ে উঠেছে। শওকত ওসমান, ফররুখ আহমদ, সিকান্দার আবু জাফর, আহসান হাবীব, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, আবু রুশদ, গোলাম কুদ্দুস, মতিউল ইসলাম, কাজী আব্দুল ওদুদ, খান বাহাদুর আব্দুর রহমান খান, নৃপেন্দ্র কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, শাহাদাৎ হোসেন, সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, জসীম উদ্দিন, নোয়েল কাওয়ার্ড, মাওলানা কাশগারী, শাহেদ সোহরাওয়ার্দী, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, কাজী আফসার উদ্দীন, হাবীবুল্লাহ বাহার, মওলানা আকরাম খাঁ, সৈয়দ বদরুদ্দোজা, সৈয়দ নওশের আলী, আব্দুর রহমান সিদ্দিকী, বিচারপতি নাসির আলী, বিচারপতি মাসুদ, আব্দুল হালিম গজনবী, নীলিমা সান্যাল ও আরো অনেকের সম্পর্কে কথকতা পাঠককে মুগ্ধ করে রাখবে। চল্লিশের দশকের কলকাতা শহর তার যাবতীয় সমৃদ্ধি ও অন্যান্য ভালোমন্দ উপকরণ নিয়ে আমাদের সামনে ধরা পড়ে। লেখকের ছাত্রী রমার কাহিনী এখানে একটু ভিন্নভাবে পরিবেশিত হয়েছে। নস্টালজিয়া আক্রান্ত এই ট্র্যাজিক কাহিনী আমরা সৈয়দ আলী আহসানের 'পসতুমাস' আমার জীবনে *রমণী-মুগ্ধতার স্মৃতি* (মাম্মী) গ্রন্থেও পড়েছি। এখানে একটু উদ্ধৃতি দিই :

রমার মৃত্যু আমাকে প্রচন্ড ধাক্কা দিয়েছিল। তার সঙ্গে অল্পদিনেই একটি মমতা এবং প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। এ সম্পর্কটি প্রেমের নয়, কোনরূপ দৈহিক আকর্ষণের নয়, কিন্তু কেমন এক প্রকার সান্তনা এবং সমর্থনের মত। রমার মৃত্যুর পর আমি আর জীবনে গৃহ-শিক্ষকতা করিনি। করবার প্রয়োজন ছিল না। কেননা আমি চাকরির প্রবাহের মধ্যে পড়ে গেলাম এবং বেকার জীবন চিরদিনের মত শেষ হল। কতদিন হয়ে গেল, অথচ এখনও সেদিনের কথা আমার সুস্পষ্ট মনে পড়ে। মনে হয় এই যেন গতকাল অসুস্থ রমাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে এসেছি। সময় হারিয়ে যায়, সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে, কিন্তু চিত্ত প্রকোষ্ঠের রেখাঙ্কন কেন জানি কোনদিন মুছে যায় না। (পৃষ্ঠা ৩৮)।

লেখকের বিয়েকে কেন্দ্র করে কিছু ঘটনা ঘটেছে। তার মনোজ্ঞ বর্ণনাও রয়েছে এ বইয়ে। কোনো রকমে 'স্বাদু বৈকল্যের সম্ভাবনা' এড়ানোর জন্যে তিনি এবং তাঁর বন্ধুরা ফররুখ আহমদ, আহসান হাবীব প্রমুখ 'সমষ্টিগত বিবেচনায়' 'কর্মধারাকে নিয়ন্ত্রিত' করতেন। কেননা তাঁরা সজাগ ছিলেন যে, 'জাতি এবং সমাজ জীবনের একটি সন্ধিলগ্নে' তাঁরা বাস করছিলেন (পৃঃ ৭২)। সুখের বিষয়, পরবর্তীকালে সমাজে উচ্চাসনও নির্ধারিত হয়ে ছিলো তাঁদের জন্যে।

২৯শে চৈত্র, ১৪১০/ ২রা এপ্রিল, ২০০৪

বাংলা নববর্ষ, তাঁর অনুভবে

নববর্ষের উৎসব নানাভাবে উদ্দীপ্ত করেছে অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসানের কল্পনাকে। হিজরী, ঈসায়ী ও বাংলা নববর্ষ নিয়ে বহু রচনা তিনি লিখে গেছেন। বিশেষ করে তাঁর শেষ বয়সে। অবশ্য এগুলো কতটা স্বতঃস্ফূর্ত আর কতটা পত্রিকা সম্পাদকদের তাগাদায় লেখা সে কথা বলা মুশকিল। তবে একজন জীবনবাদী সংস্কৃতিসেবীরূপে তিনি যে নিঃসন্দেহে যে-কোনো মানবিক সম্মেলনে কিংবা সমষ্টির মনোবাঞ্ছা পূরণে উৎসাহ বোধ করতেন, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। নববর্ষ উদযাপনের ক্ষেত্রে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার প্রথম যে ঘটনা ঘটলো তা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন মাত্রার। সেটি ঘটলো ১৩৭৮ বাংলার ১লা বৈশাখ। পার্বত্য চট্টগ্রামের রামগড় সংলগ্ন ক্ষুদ্র নদীর সাঁকোর ওপর দিয়ে পার হয়ে ত্রিপুরার সাবরুম এলাকায় উঠছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন উপাচার্য ডক্টর এ আর মল্লিক, সাবেক ডীন অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান, আরেক পর্যায়ে তাঁদের পরিবারের সদস্যবৃন্দ ও অন্যরা। প্রত্যক্ষদর্শীর জন্য সে এক দৃশ্য বটে। দেশ ছেড়ে ভিনদেশে আশ্রয় নিতেই হবে এই সুপরিচিত ব্যক্তিবর্গের। তবে শুধু আশ্রয়ের খাতিরে নয়, সেখান থেকে চালাতে হবে স্বাধীনতার সংগ্রাম। সে সংকল্প তো তাঁদের অবশ্যই ছিলো। কিন্তু সে বিশেষ দিবসটির কী রইলো অবশিষ্ট? এ সম্পর্কে সৈয়দ আলী আহসান তাঁর *যখন সময় এল* গ্রন্থে লিখেছেন :

> পনের তারিখ ছিল পহেলা বৈশাখ। প্রতি বছর পহেলা বৈশাখে আমরা উৎসব-আনন্দ করে থাকি। এ বছর আর কিছুই হল না। পহেলা বৈশাখ যে এসেছিল তাও আমরা বুঝতে পারিনি। (পৃঃ ৩৬)।

আশ্রয়ের অনুসন্ধানে তখন তিনি আগরতলার পথে। তবে পরদিন অপ্রত্যাশিতভাবে প্রধান অতিথির আসন পেলেন আগরতলা কলেজ প্রাঙ্গণে বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপনের অনুষ্ঠানে। বলা বাহুল্য, প্রশংসার ঢেউ উঠলো

তাঁর অনবদ্য বক্তৃতা শোনার প্রতিক্রিয়ায়। সেখানকার অধিকাংশ লোকই তাঁর সম্পর্কে তেমন কিছু জানতো না। তবে তাঁর দিক থেকে সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে আরো দু'চার দিন লাগলো যখন তিনি লিখে ফেললেন "আমার প্রতিদিনের শব্দ" শীর্ষক প্রসিদ্ধ কবিতাটি।

যাক, এবার আমরা আসি আরো অনেক পরের কথায়। কেননা '৭০-৮০'র দশকে লেখা 'অকেশনাল পেপারস' কিংবা ফরমায়েশী রচনাগুচ্ছে "নববর্ষ" শিরোনামের নিবন্ধাদি পাওয়া যায়নি – যেমন পাওয়া যাচ্ছে নব্বইর দশকের লেখার স্তূপে। বাংলা নববর্ষের সময় অধ্যাপক আহসান ছোট-বড় বহু নিবন্ধ রচনা করেছেন। এমনকি শতাব্দী-শুরুর পটভূমিতেও তিনি প্রবন্ধ লিখেছেন একাধিক। এ বিষয়ে তাঁর তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ :

'বিদায়ী বাংলা চতুর্দশ শতাব্দী' শীর্ষক প্রবন্ধে আমরা শুনি তাঁর উদাত্ত কণ্ঠস্বর :

> বাংলা চতুর্দশ শতকের শেষ মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আমি সকল লেখক এবং সংস্কৃতিসেবীদের কাছে একটি আবেদন করতে চাই যে, তাঁরা যেন জীবনের জন্য এমন একটি কর্মবৃত্ত নির্মাণ করেন যা আসক্তি এবং অপরাধ প্রবণতার বিরুদ্ধতা করবে। তাঁরা যেন তাঁদের জীবনবোধকে সংশয়িত না রাখেন। তাঁরা যেন বিশ্বাসের জন্য এমন একটি উপলব্ধির বলয় নির্মাণ করেন, যেখানে মানব-হিতৈষণা হচ্ছে সৃষ্টি-চৈতন্যের মূলকথা। যন্ত্রণা আছে এবং যন্ত্রণা থাকবেই। কিন্তু যন্ত্রণাকে প্রাসঙ্গিক রেখেই কল্যাণের কথা ভাবতে হবে।

এতো গেল চৌদ্দ বছর আগের কথা। সে সময়েই "পহেলা বৈশাখ" রচনায় তিনি বৈশাখকে ঐশ্বর্যের মাসরূপে বিবেচনা করেছেন। রাসুলে খোদা (সঃ) ও সুফী সাধক, বেদ এবং রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টান্ত তিনি উদ্ধৃত করেছেন বারংবার। কিন্তু ১২-৪-৯৮ তারিখে স্বাক্ষরিত "বাংলা নববর্ষ" শীর্ষক আর একটি রচনায় তিনি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন :

অনেকের ধারণা এ দিনটি হিন্দুদের একটি উৎসব। কথাটি ঠিক নয়। কৃষিভিত্তিক জীবনে ফসল তোলার কাজে যারা নিযুক্ত এ দিনটি তাদের জন্য বিশেষ উৎসবেব দিন।

> 'আমাদের জন্যে এই পহেলা বৈশাখের অঙ্গীকার হচ্ছে আমাদের জীবনবোধের অঙ্গীকার।'

অধ্যাপক আহসান লক্ষ্য করেছেন, ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেশের সর্বত্র অনবরত বৃক্ষ কর্তন চলছে। অথচ বৃক্ষের দিকে তাকালে আমাদের দুঃখভার লাঘব হতো। তাঁর মতে,

> আজ আমাদের নগর জীবনে বৃক্ষ নেই, সেখানে বিরাট বিরাট অট্টালিকা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। আর অট্টালিকার নিকটে দুঃখী মানুষেরা ছিন্ন কাঁথা বিছিয়েছে। আমরা আমাদের কর্মপ্রবাহের সূচনালগ্নে এ সমস্ত দুঃখী মানুষের দুঃখভার যদি কিছুটা লাঘব করতে না পারি এবং তাদের যদি আনন্দের অধিকার না-দিতে পারি, তাহলে আমাদের নববর্ষ পালন কি সফল হবে?

বৈশাখকে তিনি যে ইতিপূর্বে ঐশ্বর্যের মাসরূপে কল্পনা করেছেন সে তার জীর্ণতা অপসারণ করে বৃষ্টির আগমন ঘটায় বলে। বৃষ্টির স্নিগ্ধতায় ধরণীতল শীতল হয়, নতুন জন্মের জন্য ভূমি উর্বরা হয়। কৃষিজীবী মানুষরা ফসল বপন এবং কর্তন করে। বৈশাখ মানুষকে প্রত্যয়ী করে। আর একটি রচনার উপসংহারে সৈয়দ আলী আহসান লিখেছিলেন : একজন মহাপুরুষ বলেছিলেন যে, পৃথিবী যেমন জীবনকে অঙ্গে ধারণ করে মৃত্যুকেও সে অঙ্গে ধারণ করে। এভাবে উভয়কে অঙ্গে ধারণ করে পৃথিবী তরঙ্গভঙ্গের লক্ষ্যে বৈচিত্র্য নির্মাণ করে। নববর্ষের সূত্রপাতে আমরা প্রথম উষার আলোয় আলোকের তরঙ্গভঙ্গ লক্ষ্য করি। এ বিচিত্রতা মাধুর্যময়। নববর্ষের জয় হোক।

চৈত্র, ১৪১৪

সংযোজন

সম্পর্কের সূত্র ধরে

তাঁর সঙ্গে আমার দীর্ঘসূত্রী সম্পর্কের বর্ণনা দেয়া কিংবা বিশ্লেষণ করা এ মুহূর্তে যেমন অসম্ভব তেমনি হয়তো অসমীচীনও বটে। তবে সম্প্রতি অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসানের ইন্তেকালের পর বন্ধুপত্নী রাশিদা (মনিরুজ) জামান আমাকে জানালেন যে, আমি নাকি তাঁর 'ড্রিম সান' (Dream Son) ছিলাম! তিনি কথাটার একটু ব্যাখ্যাও করলেন। কিন্তু আমার বোধ ও বিবেচনা শক্তি এখন এমন ভারাক্রান্ত যে সব কিছু সব সময় স্পষ্ট হচ্ছে না। অবশ্য তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা আমার স্ত্রী নাসরিনকে বলতে শুনেছি যে, তাঁর পিতা কনিষ্ঠ পুত্র সিমাবকে সম্প্রতি জানিয়েছিলেন : কোরেশীও তাঁর আরেক সন্তান। সুতরাং তার বাড়িতে তিনি নিজের বাড়ির মতোই আছেন। সিমাব তাঁকে তার উত্তরার বাসগৃহে নিয়ে যেতে চেয়েছিল কিন্তু কলাবাগানে তিনি খুবই স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করতেন। আমাদের একান্ত সৌভাগ্য যে, জীবনের শেষ একটি বছর তিনি আমাদের সঙ্গে কাটিয়েছেন এবং শারীরীক কিছু অসুবিধা সত্ত্বেও তিনি এসময়ে বহু আনন্দ-উৎসব উপভোগ করেছেন, অনেক প্রবন্ধ/গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন এবং ক্রমশ উজ্জীবিত হয়ে উঠছিলেন। আমার কনিষ্ঠ পুত্র শাজেল (পাপ্পু) ও তার স্ত্রী পিঙকি তাঁর বিভিন্ন প্রয়াসে সহযোগিতা করতো ও তাদের দেড় বছরের পুত্র রা'দ প্রপিতামহের সঙ্গে একটু রগড় করতে ভালোবাসতো। আমাদের একমাত্র কন্যা প্রসন্না (নামটি তাঁরই দেয়া), তার স্বামী জুয়েল তাদের সদ্যোজাত কন্যা প্রমা (এটিও তাঁর দেয়া নাম)-কে নিয়ে তাঁর সঙ্গে নানা বিশ্রম্ভালাপে মগ্ন হতো। প্রসন্না তাঁর প্রকাশিতব্য কলকাতার ওপর লেখা একটি বইয়ের জন্য কিছু ছবি এঁকে দিয়েছে। আমাদের জ্যেষ্ঠপুত্র নাবিল (পুশন)-এর সঙ্গে কৌতুকপূর্ণ সংলাপে তিনি বরাবর সিদ্ধ। ওর আসন্ন শুভ পরিণয় নিয়ে তাঁর পক্ষ থেকে আসতো নানা নির্দেশ। দুটি কিশোর রাকিব ও মনির সানন্দে তাঁকে সার্বক্ষণিক সেবা দিয়ে চলেছে। সন্ধ্যা থেকে যোগ

দিতো মনিরের মা লালমোতি। সকালে তাঁর জন্য পেঁপে সিদ্ধ, ঝিঙে ভাজি, পরিজ প্রভৃতি তারই হাতে তৈরি হতো। আমার স্ত্রী তাঁর মায়ের দক্ষতা ও নিজের কমনীয়তা নিয়ে জাঁদরেল, কখনো অবাধ্য (তবে ইদানিং বড়ই সুবোধ বালক) পিতাকে নিয়মিত খাবার ও ওষুধ সেবনে বাধ্য করা বা সার্বিক তত্ত্বাবধানে সদা ব্যস্ত। আমার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ভোর সাড়ে পাঁচটা থেকে ছ'টায়। দু'জনে ডাইনিং টেবিলে বসে বেড টি (Bed tea) খেতাম এবং বিভিন্ন বিষয়ে কিছু জরুরি আলাপ সেরে নিতাম। আমার সারাদিন কাটে সাভারে, গণ বিশ্ববিদ্যালয়ে। ফিরে সন্ধ্যায় নাশতা খেতে খেতে জমতো নতুন কিছু আলোচনা।

প্রতিদিন সকাল বেলা তিনি আটটা পর্যন্ত 'ড্রয়িং রূমে' বসে পত্রিকা পড়তেন। নাশতা সেরে পড়ার টেবিলে যেতেন। 'লেখক' এলে শ্রুতলিপি দেয়া শুরু করতেন। দু'বেলায় কিন্তু তিনি ইনসুলিন নিতেন খাবার আগে। বেশ ছক বাধা জীবন! প্রত্যেক সকালেই একটি করে লেখা বেরিয়ে আসছে। চলছে বহু সাক্ষাৎকার প্রদান, টেলিফোন ও অন্যান্য যোগাযোগ।

বেশ কিছু কাল আগের কথা। অধ্যাপকের পীড়াপীড়িতে আমি একটি ইংরেজি প্রবন্ধ পুস্তকের পাণ্ডুলিপি তাঁকে প্রকাশের জন্য দিয়েছিলাম। তিনি Obor নামে একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের অনুদান পাবেন আশা করছেন। *Culture and Development* শিরনামে আমার সে গ্রন্থ ইতিহাসবিদ ড. এ. আর. মল্লিকের ভূমিকাসহ প্রকাশ পেল ১৯৮২ সালে। বইটি আমি উৎসর্গ করেছিলাম অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসানের নামে। উৎসর্গ পত্রটি ছিল নিম্নরূপ :

"Here I am restored
to my native shore
There is no history but of soul."
SAINT JOHN PERSE

"... the literary is ineluctably a historical fact ...
its historicity is a fact in our aesthetic experience"
LIONEL TRILLING

To

PROFESSOR SYED ALI AHSAN
Father, Friend and Teacher
on his sixtieth birthday
26 March 1982
M. S. Q

এদেশে সম্ভবত ইকবাল প্রসঙ্গে চল্লিশের দশকে কেউ 'ফ্রেন্ড, ফিলসফার অ্যান্ড গাইড' শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করে থাকবেন এবং তা এক পর্যায়ে জনপ্রিয়তা পায়। অনেক চিন্তা-ভাবনা করে সে সময়ে তাঁর চলমান দুর্দিনে তাঁকে কিছুটা উৎফুল্ল করবার মানসে আমি ব্যবহার করেছিলাম এমন তিনটি শব্দ যা একদিকে যেমন অযথার্থ তেমনি আবার অতি সত্য এবং সঙ্গত। 'ফাদার' পিতা, তিনি আমার নন। কিন্তু ১৯৭০ সালের ২৭শে নভেম্বরের পর থেকে আমার নবপরিণীতা স্ত্রীর অনুকরণে আজও 'আব্বু' সম্বোধন করে আসছি। আমার যথার্থ পিতা আমার কাছে 'বাবা'। দ্বিতীয় শব্দ 'ফ্রেন্ড' সেও এক অতিশয়োক্তি। বন্ধু হবার কথা ছিল না, যোগ্যতাও না। কিন্তু ষাটের দশকের গোড়া থেকে প্যারিসে তাঁর সঙ্গে বেশ ক'বার দেখা সাক্ষাতের ভিত্তিতে যেন তাও হলো। আমরা আনন্দঘণ সুরুচিপূর্ণ এক সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে একে অপরকে সহযোগিতা দান করে আসছি সুদীর্ঘকাল। অনেক সময় দীর্ঘক্ষণ একত্র থাকতে হচ্ছে দেখে তাঁর তৃতীয় সফরের পর থেকে প্যারিসে তাঁর অনুমতি নিয়ে আমি তাঁর সামনে সিগারেট খেতাম। একবার দেশে ফিরে ১৯৬৫ সালে বাংলা একাডেমীতে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলে এবং পরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৬৮ সালের আগস্টে অধ্যাপনা কর্মে যোগদান করলে অনেকে অবাক হয়ে যেতেন আমার এই বেয়াদবি-সদৃশ কার্যকলাপে। ১৯৭১ সালে কলকাতায় আরেক দুঃসময়। তাঁকে একটু এগুতে দিয়ে আমি পেছনে পেছনে 'চারমিনার' ফুঁকে চলেছি। ১৯৭৪-এর গোড়া থেকে ধূমপান বিসর্জন দিয়ে নানা দিক থেকে অব্যাহতি লাভ করি এই অবাঞ্ছিত সমস্যার।

তৃতীয় অভিধা 'টিচার' – শিক্ষক। সেটিও ঠিক না। ১৯৫৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালযের বাংলা বিভাগে আমি ভর্তি হই। তখনকার অধ্যক্ষ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ অল্প কদিন পর অবসর গ্রহণ করেন। বিদায়-সভায় আমাদের প্রতিনিধি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছিলেন যে, আমরা যথার্থভাবে তাঁর 'ছাত্র' হতে পারিনি কারণ তিনি আমাদের কোন ক্লাস নেননি। শহীদুল্লাহ সাহেব পরদিনই একটি ক্লাসে এসে আমাদের 'ছাত্র' বানিয়ে গেলেন। অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান তার কিছু পরে করাচীর উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন। তিনিও আমাদের কোনো ক্লাস নেননি। সৌভাগ্যবশত বিভাগীয় 'গ্রুপ' ছবিতে আমিও কী করে জানি অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলাম। অর্থাৎ

সরাসরি তাঁর ছাত্র হবার সুযোগ আমার ঘটেনি কিন্তু ছাত্রদের মধ্যে আমি আছি। ঠিক একই ভাবে মুনীর চৌধুরীর মতো প্রবাদপ্রতিম শিক্ষকেরও আমি ছাত্র হতে পারিনি যদিও তাঁর স্নেহভাজন হবার সুযোগ ঘটেছিল পরবর্তীকালে।

এরপর প্রফেসর আহসানের সঙ্গে প্যারিসে সাক্ষাৎ – যা তিনি সবিস্তারে লিখে গেছেন "মাহমুদ শাহ্ কোরেশীকে যেভাবে পেলাম" নিবন্ধে *মাহমুদ শাহ্ কোরেশী সংবর্ধনা গ্রন্থ : Dialogue of Cultures* শীর্ষক ত্রিভাষিক গ্রন্থে। অবশ্য বহুপূর্ব থেকে আমি তাঁর সম্পর্কে অবহিত হয়েছি প্রথমত প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীরূপে তাঁর লেখা *Our Heritage* গ্রন্থ নির্বাচন ও অধ্যয়ন করে। এরপর এক বন্ধুর কাছে ১৯৫২ সালে তমদ্দুন মজলিশের সাহিত্য সম্মেলনে তাঁর "কবিতার কথা" শীর্ষক প্রবন্ধ-পাঠের কথা শুনে এবং তার একটি মুদ্রিত কপি পেয়ে। তাছাড়া ১৯৪৮ সাল থেকে *সওগাত, মোহাম্মদী, মাহেনও* প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর বহু লেখা কবিতা-প্রবন্ধ আমি পড়েছি। ক্রমশ অবহিত হয়েছি ১৯৪২ সালে তাঁর প্রতিষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ-এর কার্যকলাপ সম্পর্কে। সম্প্রতি আমি সে সময়কার *পাকিস্তান* পত্রিকাটির কয়েকটি সংখ্যাও দেখেছি। অনেকে হয়তো জানেন না এই সংসদের সঙ্গে কোনো-না-কোনো ভাবে অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক, ড. মাজহারুল হক, মুনীর চৌধুরী, সরদার ফজলুল করিম প্রমুখও জড়িত ছিলেন। ১৯৬২ সালে প্যারিসে ইকবালের জীবনীকার ও অনুবাদক ল্যুস ক্লোদ মেৎর-এর সঙ্গে তাঁর *অনেক আকাশ* কাব্যের বেশ কটি কবিতা অনুবাদ করি। ১৯৬৫ সালে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করে গ্রীষ্মাবকাশে আমি দু'মাসের জন্য দেশে ফিরি। ইতিপূর্বেই আমি প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের (সর্বন) সংলগ্ন প্রাচ্যবিদ্যা প্রতিষ্ঠানে প্রভাষক পদে নিযুক্ত হয়েছিলাম। আমার দেশে ফেরার আগ্রহ দেখে বাংলা একাডেমীর পরিচালক রূপে তিনি এবং বেঙ্গলি ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের পরিচালক ড. মুহম্মদ এনামুল হক আমাকে আরো কিছু দিন প্যারিসে অবস্থানের পরামর্শ দেন। সেই সুযোগে আমি ইউনেস্কোর জন্য ফরাশি ভাষায় 'বাংলা মরমী কবিতা' গ্রন্থের অনুবাদ ও আলোচনার কাজ সমাপ্ত করি। 'বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ' সম্পর্কিত আমার অভিসন্দর্ভটিও প্রকাশের ব্যবস্থা হয় বিশ্বের একটি সেরা প্রকাশনালয় থেকে। ১৯৬৮ সালের আগস্টে আমি চট্টগ্রাম

বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিই এবং সে সময় থেকে প্রত্যক্ষভাবে তাঁর ইন্তেকাল পূর্ববর্তী সময়টিতে আমি অনেক কাজে তাঁর সহযোগীর ভূমিকা পালন করেছি। অনেক বিষয়ে আমি যেন তাঁর 'ডাইরেকটরী'। অমুক বিষয়ের বই, তমুকের নাম আমাকে তাৎক্ষণিকভাবে বলতে হতো। ইদানিং আমারও স্মৃতিভ্রংশ হচ্ছিল বলে কিছুটা বিব্রতবোধ করছিলাম। কিন্তু সে কাজ থেকে তিনি যেন আমাকে অব্যাহতি দিয়ে চলে গেলেন এখন।

কিন্তু পড়ে আছে বিপুল কাজ। প্রকাশিত শতাধিক গ্রন্থ ছাড়াও তাঁর বহু লেখা ও বই অমুদ্রিত বা অসমাপ্ত রয়েছে। অগ্রন্থিত প্রবন্ধাদি সংগ্রহের যেমন প্রয়োজন তেমনি একটি সম্পূর্ণ তালিকা প্রস্তুতও জরুরি হয়ে পড়েছে।

সৈয়দ আলী আহসানের বিভিন্নমুখী প্রতিভার স্বীকৃতি তিনি প্রভূতভাবে পেয়েছেন। শুনেছি ষষ্ঠ বা অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র থাকার সময়ে ধামরাইয়ে তাঁকে কেউ কেউ কাঁধে করে বক্তৃতার জন্য নিয়ে যেতেন। আমি তাঁকে দুটি অসামান্য বক্তৃতা করতে শুনেছি – একটি কলকাতার বুদ্ধিজীবীদের কাছে, ১৯৭১ সালে, অন্যটি নারায়নগঞ্জের ওলামা মাশায়েখদের সামনে, ১৯৭২ সালের গোড়ার দিকে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ফ্যাকাল্টি মিটিঙে কেউ কেউ যখন উত্তপ্ত বিতর্কে মেতে উঠেছেন, তখন দেখেছি তাঁকে সভাপতির আসনে বসে সমর্পিতচিত্তে কবিতা লিখে যেতে। একবার তৈরি হয়ে এলে তাঁকে নিয়ে কোথায় যেন বাইরে যাবো, এমন সময় কবি-সম্পাদক আল মুজাহিদীর আবির্ভাব। তিনি একটি প্রবন্ধের কথা বলে রেখেছিলেন। কিন্তু 'লেখক' আসেননি, তাই লেখা হয়নি। আল মুজাহিদী শ্রুতিলিপি নিলেন। বিশ মিনিটের মধ্যে "রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা" বিষয়ক প্রবন্ধ তৈরি হয়ে গেল দৈনিক ইত্তেফাকের সাহিত্য-পাতার জন্য। আরেকবার "নজরুলের কবিতার ছন্দ" বিষয়ক প্রবন্ধও তিনি এভাবে ডিক্‌টেশনের মাধ্যমে তৈরি করিয়েছিলেন – কোনো নোট বা পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়া। এই তো ক'মাস আগে আল মুজাহিদী আরেক অসাধ্য সাধন করেছেন : 'স্যারের একটা কবিতা দরকার' বলে সেটাও একই পদ্ধতিতে বের করে নিলেন। অথচ বাংলা একাডেমীর কাল থেকে গদ্য লেখা তিনি ডিক্‌টেশনের মাধ্যমে প্রস্তুত করতেন বটে কিন্তু কবিতা স্বহস্তে লিখতেন, সাধারণত প্রত্যুষে। প্রয়োজনে অবশ্য পরিবর্তিত হতো কার্যক্রম। সারাদিনই কোনো-না-কোনো বই

পড়তেন এবং টিভিতে নানা প্রোগ্রাম দেখতেন। অসম্ভব দ্রুত একটি বই পড়া সমাপ্ত করতে পারতেন তিনি এবং ভালো-মন্দ অভিমত দিতে সক্ষম হতেন উদ্ধৃতি সহকারে।

জীবিতাবস্থায় তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখার সামান্য বর্ণনা দেব। ২৪শে জুলাই সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় তাঁকে আমি তাঁরই দাবীতে এক স্লাইস অতি উত্তম পাঁউরুটি ফরাশি পনীর La Vache qui rit (লা ভাশ্ কি রি – "যে গাভী হাসে") মাখিয়ে দিয়েছিলাম। অত্যন্ত তৃপ্তির সঙ্গে তিনি খেয়েছিলেন এবং আমার সেদিনের সাভারের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করেছিলেন। রাত আট'টায় তিনি গরম চাপাতি ও সবজি দিয়ে নৈশাহার সমাপ্ত করেন। কিছু পড়াশুনা ও টিভি দেখা সেরে রাত সাড়ে ন'টায় তিনি শুয়ে পড়েন। তারপর দু'টোর সময় উঠে শৌচাগারে যান, পানি খান এবং তাঁর কক্ষে অবস্থানরত মনিরের সঙ্গে একটু আলাপও করেন। এরপর যে নিদ্রামগ্ন হলেন সে ঘুম আর কখনো ভাঙ্গেনি। সকাল থেকে আমাদের জীবনধারাও অন্যরকম হয়ে গেল। তবে দেশের সরকার ও গণমানুষের যে অভূতপুর্ব শ্রদ্ধা-ভালোবাসা তাঁর প্রতি ছিল ঢাকা থেকে সাভারে সমাহিত হবার যাত্রাপথে তার বহিঃপ্রকাশে আমরা যথার্থভাবে অভিভূত।

এদেশের সরল ধর্মপ্রাণ কিংবা সংস্কৃতিবান ও যথার্থ বিদগ্ধ মানুষের কাছে তিনি কিংবদন্তী হয়ে থাকবেন – এতে আমি অন্তত নিঃসন্দেহ।

জুলাই ৩০, ২০০২

প্রাথমিক প্রয়াস

মাত্র পাঁচটি স্বরচিত ও তিনটি অনূদিত কাব্যগ্রন্থ নিয়ে সৈয়দ আলী আহসানের *কাব্যসমগ্র* প্রকাশিত হয় ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বরে। এরকমের শিরনাম খচিত গ্রন্থের ব্যাপারে আমার বা অন্য শুভানুধ্যায়ীর মৃদু আপত্তি তিনি গ্রহণ করেননি। সম্ভবত তিনি ভেবেছিলেন সামাজিক পেশাগত দায়িত্বের কারণে উত্তর-পঞ্চাশে তিনি কবিতার ক্ষেত্রে আর বেশী দূর এগুবেন না। বাস্তবেও তাই ছিল, তবে পরবর্তী কালে তাঁর আরো কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে এবং অগ্রন্থিত ও অপ্রকাশিত কবিতার সংখ্যাও খুব কম নয়। তাছাড়া এযাবত প্রকাশিত অথচ অনেক সময় দুষ্প্রাপ্য কিন্তু সমুদয় একত্রে তাঁর সামগ্রিক কাব্যভাবনা সমেত প্রকাশিত হলে পাঠক সমালোচক তাঁর কবি পরিচিতির প্রতি যথাযথভাবে আকৃষ্ট হতে পারতেন।

শিরনামের ক্ষেত্রে অন্যরকম জরুরি বিষয় হয়তো তাঁকে পীড়া দিয়ে থাকবে। সেটি হলো, ১৯৫৬ সাল থেকে তিনি ক্রমাগত দেশের বাইরে যান এবং আধুনিক আন্তর্জাতিক সাহিত্য ভুবনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ক্রমশ নিবিড় হয়ে ওঠে যা আমৃত্যু তাঁর সাহিত্যকর্মে সুস্পষ্ট ছাপ রাখে। সে কারণে তাঁর লেখা ১৮ থেকে ২৫ বছর সময়কালে ইসলামী বিষয়ক কবিতা বা অন্যান্য রচনাও গ্রন্থাকারে পরবর্তী কালে তিনি প্রকাশ করেননি। তাঁর যুক্তি ছিল, "সেগুলো ... কাব্যরচনার উন্মেষের সংবাদ বহন করে সত্য কিন্তু কোনও প্রকার কাব্যগত সিদ্ধির পরিচয় বহন করে না"। এমন কি টি. এস. এলিয়ট প্রভাবিত *"চাহার দরবেশ"* (১৯৪৫) পর্যন্ত তিনি গ্রন্থভুক্ত করেননি। কেননা শব্দ ব্যবহারে এই কবিতাটিও তাঁকে সম্পূর্ণ স্বস্তি দিতে দিতে পারেনি এবং এখানেও তাঁর ধারনা তিনি তাঁর ভাষাকে আবিষ্কার করতে সক্ষম হননি। এ সম্পর্কে তিনি আরও একটু ব্যাখ্যা করে বলেন, "একটি রোমান্টিক আবহের মধ্যে আবর্তিত হয়ে শব্দকে ছন্দ ও অলংকারের চাতুর্যে চঞ্চল করেছি কিন্তু আমার নিজস্ব বক্তব্য মূর্ত করতে পারিনি।" (*কাব্য সমগ্র;* পৃঃ ১৭) তাঁর অনুজ সৈয়দ আলী আশরাফ যিনি নিজেও একজন কবি, সাহিত্য সমালোচক

ও ইসলামী চিন্তাবিদ, পরবতীকালে তাঁর এপর্বের কবিতা গুচ্ছ *চাহার দরবেশ ও অন্যান্য কবিতা* শিরনামে ভূমিকাসহ সংকলন এবং প্রকাশনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন (মোকাররম পাবলিশার্স, ঢাকা, (১৯৮৫)। আলী আশরাফ ভাবগত দিক থেকে বিচ্ছিন্ন কবিতাসমূহের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য, রচনাগত সৌন্দর্য – কখনো বা দুর্বলতার দিকটি ও চিহ্নিত করে অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, 'আলী আহসান সাহেবের প্রাথমিক কাব্যরচনাকে এই একটি পরিণত স্টাইল গড়ে তোলার প্রয়াস বলে বর্ণনা করতে পারি। এই স্টাইল পরবর্তী জীবনে পরিবর্তিত হয়েছে সত্য কিন্তু পরিবর্তন বির্বতনের মাধ্যমে রূপায়িত হয়েছে। বৈপ্লবিক নতুনত্বের সাধনায় আকস্মিক রূপ গ্রহণ করেনি। সে হিসেবে তাঁর এ জীবনের কাব্যরচনা তাঁর সমগ্র কাব্যকে বুঝবার পক্ষে সাহায্যকারী' (ভূমিকা, পৃঃ ২৩)।

তাছাড়া তিনি লক্ষ্য করেছেন, কবি সৈয়দ আলী আহসানের সত্যিকারের ঐতিহ্য, তাঁর আভ্যন্তরীন ধর্মবোধজাত। এবং এধর্মবোধ সূফী সাধনার ঐহিত্যসম্বলিত।

'তাঁর প্রধান কাব্যগুণ হচ্ছে স্বচ্ছ সাবলীল গতিতে ভাষাকে যেন প্রবাহিত করে দেওয়া। কঠিন শব্দ ব্যবহার করলেও সব সময়ই এবং সর্বক্ষেত্রেই তিনি সহজ সচলতার সৃষ্টি করেছেন।' ...

'তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগুণ হচ্ছে সার্থক রোমান্টিক পরিবেশ সৃষ্টি করা।'

এই সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মূল্যবোধ সম্বন্ধে সচেনতা প্রশংসনীয়। মুসলমান ঐতিহ্য থেকে মূল্যবোধ আহরণ করে কাব্যের অন্তর্নিহিত কাঠামো হিসেবে তাকে পেশ করতে তিনি সক্ষম হয়েছেন। *চাহার দরবেশে*'র প্রতিটি কাহিনীর মূলে দেখি সেই মূল্যবোধ। প্রেম এবং হিংসার দ্বন্দ্ব সংঘাত একমাত্র আত্মিক প্রেম দিয়ে বিদূষিত করা যায় – এ কবিতায় আমরা এই বিশ্বাসের প্রতিফলন পাই। এই মূল্যবোধই তাঁর বিচিত্র জীবনের বিভিন্ন কাব্যরচনায় সাহায্য করেছে। প্রাথমিক কাব্য রচনাকালে এই যে কতিপয় মূল্যবোধজনিত ভাবাবেশ – তাই তাঁর কাব্যের প্রধান আশ্রয়স্থল।'

কিন্তু এতেই শেষ নয়। উন্মেষযুগের ইসলামী ভাবাবহ সম্বলিত উপর্যুক্ত কবিতাবলীর পাশাপাশি কিছু সংখ্যক 'সমাজ সচেতন প্রতিবাদী কবিতা'ও তিনি লিখেছিলেন প্রতিবাদী হোক বা না হোক, সাধারণভাবে মানবিকবোধ সম্পন্ন এধরনের এগারোটি কবিতা, দুটি গল্প এবং তিনটি প্রবন্ধের একটি সংকলন প্রকাশিত হয় ফজলে রাব্বির সম্পাদনায় *রজনীগন্ধা* শিরনামে একাডেমিক পাবলিশার্স, ১৯৮৮)। উল্লেখ্য যে, এছাড়া ও কিছু রচনা কাজী

নজরুল ইসলাম সম্পাদিত *নবযুগ*, প্রেমেন্দ্র মিত্রের *নিরুক্ত* বা অন্যান্য সাময়িকীতে অগ্রন্থিত অবস্থায় পড়ে আছে। *রজনীগন্ধার* ভূমিকার উপসংহারে ফজলে রাব্বির মন্তব্য এখানে প্রণিধানযাগ্য :

> ... প্রথম পর্বের সৈয়দ আলী আহসানকে পুরোপুরি অস্বীকার করে পরবর্তী পর্বের সৈয়দ আলী আহসানের কাছে আসা সম্ভবপর নয়। প্রথম পর্বে তিনি যা লিখেছিলেন তার সবটাই যে গ্রহণযোগ্য আমি তা বলছিনা, কিন্তু সেগুলোর যে তাঁর পরবর্তী সাধনার ভিত্তিমূলে কাজ করেছে এ কথা অস্বীকার করা যায় না। সে সময় তাঁর অভিজ্ঞতা চূড়ান্ত কোন একরূপে প্রকাশ পায়নি সত্য। কিন্তু অসম এবং অসম্পূর্ণ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আমরা একটি বিশিষ্ট প্রতিভার স্ফুরণ লক্ষ্য করি।

কিন্তু শুরুর আগেও আছে শুরু। অথবা বলা চলে শুরু করার প্রাথমিক প্রয়াস। এই শুরুটা সম্ভবত সর্বসাধারণের জন্য ছিল না। একেবারে যে ছিল না তাও বলা যাবে না। ইতঃপূর্বে আমরা ২টি গ্রন্থে ধৃত এবং তার বাইরের যে রচনা সমূহের কথা উল্লেখ করেছি সেগুলো হলো প্রধানত সৈয়দ আলী আহসানের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালীন সময়ে লিখিত এবং খ্যাতনামা সাময়িকীতে প্রকাশিত কিন্তু তার আগে তাঁর স্কুল ও কলেজ জীবনে কি কিছুই লেখা হয়নি? আগে যা লেখা হয়েছে তার মধ্যে কি উল্লেখযোগ্য কিছুই নেই? সবই কি বিলুপ্ত হয়ে গেছে? অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়ে আমরা সহজে একটি কবিতার কথা জানতে পারি। সেটি হলো আরমানিটোলা স্কুলে ছাত্র থাকার সময়ে তিনি একটি ইংরেজি কবিতা হঠাৎ করে লিখে ফেলেছিলেন স্কুল ম্যাগাজিনের জন্যে। কবিতাটি নাম "The Rose" এবং তাঁর ছোটবোনের গৃহ শিক্ষক মতিউল ইসলাম (তিনি পরবর্তীকালে কবিখ্যাতি অর্জন করেন, ব্রাহ্মনবাড়িয়ার অধিবাসী, কর্মজীবনের শেষ পর্যায়ে চট্টগ্রামে আমদানী-রফতানী বিভাগের কর্মকর্তা ছিলেন।) সেটির বাংলা রূপান্তর একটি পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন। তাছাড়া, তাঁর কণিষ্ঠা কন্যা সৈয়দা কমর জাবীনের সংগ্রহে রয়েছে *অভ্যুদয়* শিরনামে ডবলক্রাউন সাইজের একটি হাতে-লেখা সংকলন। এটি ঠিক পত্রিকার মতো সাজানো নয়, বরং সুন্দর একটি এলবামের মতো সংগ্রথিত – অনেকগুলো ছবি, কবিতা, কথিকা ও উদ্ধৃতাংশ দিয়ে। এবং এটি হলো দুই বন্ধু-সহপাঠী মাহবুবুর রহমান খাঁ ও সৈয়দ আলী আহসানের যৌথ প্রয়াস। সংগ্রহকারিনী তাঁর পিতার কাছ থেকে জেনেছিলেন যে, ওঁরা যখন দশম শ্রেণীর ছাত্র তখন এই সংকলনটি তৈরি করেন। যেখানে-সেখানে পড়ে থাকতে দেখে, তাঁর

কন্যা সত্তরের দশকের এক সময়ে এটি নিজের কাছে সংরক্ষণের ইচ্ছা প্রকাশ করলে তাঁর পিতা এটি তাঁকে দিয়ে দেন। সংকলনটির কোনো দ্বিতীয় কপি মাহবুবুর রহমান খাঁর পরিবারে আছে কিনা জনা যায়নি।

প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ আব্দুর রহমান খাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র মাহবুবুর রহমান খাঁ ছিলেন সৈয়দ আলী আহসানের আত্মীয় ও ঘনিষ্ঠতম বন্ধু। দুই কিশোরের নানা রোমান্টিক কল্পনা, জীবন ও জগৎ সম্পর্কে সৃজ্যমান ধারণা, আমরা এখানে পাই। সৈয়দ আলী আহসান যখন বাংলা একাডেমীর পরিচালক এবং মাহবুবুর রহমান খাঁ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত তখন শেষোক্ত অতি নম্র সজ্জন ব্যাক্তিটি আকস্মিকভাবে পরলোক গমন করেন। সৈয়দ সাহেবও গত ২৫শে জুলাই ২০০২ সালে হঠাৎ চিরতরে বিদায় গ্রহণ করলেন। এখন এই সুদৃশ্য সংকলন সম্পর্কে বিশেষ বিবরণ দেবার আর কেউ নেই। বলা বাহুল্য *অভ্যুদয়* প্রসঙ্গে কিঞ্চিত আলোকপাত করা হল এই ভেবে যে, আত্মীয়-স্বজনের গন্ডী পেরিয়েও কবির কৈশোরিক কাব্যকীর্তি অনুরাগী মহলে পরিচিত হলে তাঁর সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা তৈরী করা সম্ভবপর হবে। এখানে 'কাব্যগত সিদ্ধির' প্রশ্নটি আমরা বিবেচনায় আনছি না আদৌ বরং শিক্ষাগত সৌকর্যে আগ্রহী, জীবন সম্পর্কে কৌতূহলী দুই নবীণ সাহিত্যকর্মীর পরিচর্যা লক্ষ্যণীয় বলে মনে করছি।

পৃষ্ঠাসংখ্যাবিহীন *অভ্যুদয়ের* প্রায় গোড়ার দিকে সৈয়দ আলী আহসানের একটি রচনা 'জন্মদিন' (মূল বানান সহ) উদ্ধৃত হচ্ছে :

'মানুষের জীবনে এক এক মুহূর্ত আসে আনন্দের সওগাত নিয়ে। হঠাৎ আবার তা চলে যায় – তখন জগতের কোন কিছুর বিনিময়েও সেই মধুর হারানো মুহূর্তগুলো আর ফেরৎ পাওয়া যায়না, চিরতরে অজ্ঞাতে বিলীন হয়ে যায়। প্রতি বছর একটি দিন জন্মদিনের মধুরিমা নিয়ে আসে। সে শুনায় আমাদেরে চিরতরে হারানো একটি দিনের গানের সুর, সে নিয়ে আসে আমাদের কাছে অজ্ঞাত নিখিলের বার্তা। ভাষাহীন শৈশবের প্রকাশহীন রূপে মুগ্ধ বিস্মত মানব মনের এক নিভৃত কন্দরে সে আলো জ্বালিয়ে দিয়ে আনন্দে আত্মহারা।

জন্মদিনের প্রভাতের অরুণ আলোয় উদাসী শুকতারার আহ্বান আসে, বিভাসে ললিতে বেজে উঠে বাঁশি, তমাল কুঞ্জে বনের পথে শুনা যায় শ্যামল ঘাসের কান্না, মানব-চিত্ত-গগনের দূর

দিকসীমা বেদনার রাঙা মেঘে মহিমা পেয়ে জেগে উঠে। শ্যামল কুঞ্জের পথ দিয়ে আসে উদাসী পথিক – সঙ্গে তার বরণডালা। আনন্দ মাঙ্গল্য হাতে নিয়ে উদাসী গেয়ে যায় গান, তার গানের সুর মানুষের প্রাণে কাঁপন জাগায়, নবসৃষ্টির স্বপ্নে সে বিভোর।'

পনেরো-ষোলো বছর বয়সে কিংবা তার ও কিছু কম বয়সে লেখা এই রচনা কি পরবর্তী কালের কোনো পূর্বাভাস সূচিত করে?

অভ্যুদয় প্রকাশনা ও সূচির নির্দেশকরূপে রয়েছে সম্পাদনা মহবুবুর রহমান খাঁ (আলী আহসান সাহেব 'মাহবুব' লিখতেন না), পরিকল্পনা – সৈয়দ আলী আহসান; লেখকদ্বয় মহবুব ও আহসান; চয়ন – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধায়, স্বামীবিবেকানন্দ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, মোহিতলাল মজুমদার, কাজী আব্দুল ওদুদ, গোলাম মোস্তফা, পরিমল কুমার ঘোষ, ওমর খৈয়াম, Emerson প্রমুখ।

এক পৃষ্ঠায় রয়েছে "সমুদ্রে ঝড়" শীষক কথিকা যা শরৎচন্দ্রের ভাব অবলম্বনে রচিত বলে উল্লেখ করা রয়েছে। সৈয়দ আলী আহসানের "প্রশ্ন" কবিতাটি এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

কোথায় শরণ লভিবে বিরহী
নিদয় প্রেয়সী ছেড়েছে যাহে?
কোথায় শরণ লভিবে সে জন
গাহিছে যে গান দুঃখ দাহে?
যেখানে ফুটিছে গোলাবের কলি
পাখীর কাকলী যেখানে আসে
সেখানে বিরহী অজানা সুরে কি
প্রিয়ার ব্যথার গানটি গাহে?
তটিনী যেথায় মূরছিয়া পড়ে
জল কল্লোল লভিছে রোল,
যক্ষ যেখানে আপনার জন
পেয়েছে প্রসারি আপন কোল;
রঙীন প্রসূন ফুটিছে যেথায়
যেখানে কোকিল গাইছে গান
বিরহী সেখানে আসিবে কি ভুলে
ধরিবে কি আজ মোহন তান?
কখনো বিরহী পাইবেকি ফিরে

তাহার হারানো প্রেয়সীবালা?
প্রশ্ন খুঁজিছে আপন মুক্তি
বিরহী পাইছে শুধুই জ্বালা ॥

মহবুবের "জীবনপথের বন্ধু" রচনার পর সৈয়দ সাহেবের আরেকটি রোমান্টিক কথিকা "সে ও আমি"। নীচে রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতি। সৈয়দ সাবের পরিবেশ স্নিগ্ধ "প্রভাত" ও প্রেমার্ত ভাব-ভাবনার কবিতা "বঁধু"। উল্লেখ্য যে, রমনীর প্রতিকৃতি ছবি কেটে সুন্দরভাবে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে প্রায় পৃষ্ঠায়। মহবুবের রচনা "তাজমহল" সুন্দর ফটোগ্রাফ ও অতি পরিচিত রবীন্দ্র উদ্ধৃতি "এক বিন্দু নয়নের জল / কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল / এ তাজমহল।" মোহিতলাল, বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে চিত্তোৎকর্ষ সাধনের প্রয়াসও লক্ষ্যযোগ্য। "আনন্দ" শীর্ষক একটি কথিকা ছাড়াও সৈয়দ আলী আহসানের "আমার কবিতা" তাঁর অগ্রযাত্রার আলোকে কৌতূহলোদ্দীপক :

... বাতাসে নিবিলে দীপ
চাঁদের আলোক আকাশের ভালে
আঁকে সন্ধ্যার টীপ;
তেমতি আমার গীতি
আমার বিদায়ে আনিবে বিশ্বে
আমারই নমস্কৃতি ॥
হাসিমুখে ভোররাতে
লিখিব আলোর আগমনী আমি
আঁধারের শেষপাতে;
জ্বালাইব আলোখানি
তাহাতে আঁধার দূর হবে কিনা
তাহা আমি নাহি জানি ॥
ফুল পেতে চায় ফল
আমার কবিতা পূর্ণতার পানে
চলিবারে চঞ্চল ॥

এরপর রয়েছে AG Gandiner অনুকরণে লিখিত একটি ক্ষুদে গল্প "সহযাত্রী"। বন্ধুবরের জন্মদিনে মহবুব সাহেবের একটি কবিতা বঙ্কিমচন্দ্র ও স্বামী বিবেকানন্দের দুটি উদ্ধৃতি : বঙ্কিম যেখানে "কবির সৃষ্টি তাঁহার

স্বেচ্ছাধীন" মনে করেন, সেখানে স্বামীজির ঘোষণা "জীবে প্রেম করে যেই জন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।" অতপর সৈয়দ আলী আহসান "স্বপ্ন" শীর্ষক একটি কথিকায় জীবন সিন্ধুতীরে নারী-পুরুষ দেবতার কাছে থেকে বর নিল প্রেম ও স্বাধীনতা। তাঁর অনুবাদ ইয়েটস থেকে "O Do Not Love Too Long", দার্জিলিঙে আবস্থানরত বন্ধু মহবুবের কাছে সৈয়দ আলী আহসানের "ছিন্নপত্র" এবং একটি কবিতা "দরিদ্র"। মানচিত্র ও প্রকৃতিসহ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কবিতা "বঙ্গ আমার! জননী আমার! ধাত্রী আমার! আমার দেশ!"

একটি লাল গোলাপ শুভেচ্ছা "বাংলা সাহিত্যের জনকয়েক পূজারী [রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন দত্ত, শরৎচন্দ্র]" ছবি, উদ্ধৃতি ও স্বাক্ষর প্রশংসনীয় সংগ্রহ বটে! একমাত্র রবীন্দ্রনাথের জন্য তাঁরই স্বরচিত একটি স্তবক!

"বাংলার কবি, ভারতের কবি
বিশ্বের কবি তুমি
সবাই জানায় প্রণতি তোমায়
তোমার চরণ চুমি।"
– আহসান

উল্লেখ্য যে রবীন্দ্রনাথ তখন ও জীবিত।

এরপর ওমর খৈয়াম থেকে উদ্ধৃতি : জীবন মরন যুগল প্রবাহ / বয়ে যায় সাথে সাথে / নূতনের সাথে পুরাতন যেন / মিলিয়ারে হাতে হাতে" ইত্যাদি। বন্ধুর আসন্ন বিদায় উপলক্ষে "তুমি কি চলেছ?" শীর্ষক কবিতায় উৎকণ্ঠার সার্থক রূপ লক্ষ্যণীয়। মহবুবের 'এসলাম' শীর্ষক সুবৃহৎ প্রবন্ধের অংশবিশেষ, বিশেষভাবে চিত্রিত রবীন্দ্রনাথের "বর্ষামঙ্গল" কবিতা; সৈয়দ সাহেবের বেদনাবিধুর রচনা "বেহালার ঝংকার" তাঁর "প্রলয়" কবিতা রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের দ্বৈত প্রভাবযুক্ত মনে হয়। কিন্তু নজরুলের কোনো উল্লেখ কোথাও নেই বরং এর পরপর রবীন্দ্রনাথের "নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস / শান্তির ললিত বানী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস উদ্ধৃত। এরপর রয়েছে তাঁর অনুবাদে ওমরের তিনটি রুবাই-য়াত, টুর্গেনিভের "যিশু" শীর্ষক একটি নীতিমূলক কাথিকা। সমকালীন কোনো কবি সম্ভবত তাঁদের শিক্ষক পরিমল কুমার ঘোষের একটি কবিতা তাঁরই হস্ত াক্ষরে সংযোজিত, অধিকন্তু কালীপদ সরকারের "কুলী" – পাঁচ পৃষ্ঠার কাহিনীটিও। সম্ভবত তাঁরই হস্তাক্ষরে স্থান পেয়েছে। সৈয়দ আলী আহসানের সর্বশেষ রচনা "পথে বেরিওনা" শীর্ষক ছোট কবিতা :

পথে বেরিওনা সেখানে অনেক লোক চলাচল
গণনাহীন
নিজেকে সেখানে খুঁজে পাবে নাকো –অভিমান সেথা
মূল্যহীন?
এর চেয়ে থাকো ঘরের কোনায়, আপনার মাঝে
হও বিলীন
বাইরে থাকুক শুধু কোলাহল, পৃথিবী থাকুক
সীমানাহীন।

এরপর মহবুবর রহমানের "স্মরণে" শীর্ষক কবিতা, "শেষ" শীর্ষক একটি কবিতার উদ্ধৃতি :

"এবার বোবা পেয়েছে তার ভাষা
যাবার বেলা জানিয়ে যাবে চির নীরব মূকের ভালোবাসা"

সব মিলিয়ে সৈয়দ আলী আহসান ও তাঁর বন্ধুর এক অসামান্য কৈশোরিক সাহিত্যকর্ম আমাদের হস্তগত হয়েছে যা যথার্থভাবে বিচার-বিশ্লেষণের উর্ধ্বে, শুধু আনন্দভোজ রূপেও চিহ্নিত হতে পারে।

রচনা : ২২.০৩.২০০৮
সংযোজন : ২২.১২.২০১০

আবু রুশদের সঙ্গে সম্পর্ক ও অন্যান্য

কথাশিল্পী আবু রুশদ তাঁর সাহিত্যিক সহকর্মী-বন্ধু অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসানকে এক কপি *স্বনির্বাচিত গল্প* গ্রন্থ উপহার দিয়েছিলেন। স্বহস্তে লিখিত একটি উৎসর্গ-পত্রও সেখানে ছিল – *"আলী আহসানকে, সেই কবে থেকে আলাপ। আশাকরি তা এখনও বিলাপের কারণ হয় নি।" আবু রুশদ, ঢাকা, ২৫.০৫.৭৯*

পরবর্তী বাইশ-তেইশ বছরে অর্থাৎ অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসানের ইন্তেকাল অবধি আমরা লক্ষ্য করেছি যে তাঁদের সুদীর্ঘ কালের 'আলাপ' কখনো 'বিলাপে' পরিণত হয়নি। তবে তাঁদের সেই আলাপ ছিলো এক সমৃদ্ধ সংলাপ যা যথেষ্ট সংযত ও সংহত। কবে তার সূত্রপাত, কীভাবে, কী কী বিষয়ে তাঁদের আগ্রহ, অর্থাৎ তাঁদের সখ্যতার ইতিবৃত্ত আমাদের জানা নেই। বর্তমানে সম্ভব নয় এর ধারাসূত্র নির্মাণ।

তবে বয়সে সামান্য জ্যৈষ্ঠতার জন্যে হোক, কিংবা কনিষ্ঠ ভ্রাতা রশীদ করীমের সঙ্গে উচ্ছ্বসিত সৌহার্দ্যের কারণে হোক, সৈয়দ আলী আহসান সাহেবকে আবু রুশদ সম্ভবত অনুজপ্রতিমই ভাবতেন, অনেকটা সেভাবেই কথাবার্তা বলতেন। অবশ্য দু'জনের মধ্যে ছিলো গভীর পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও ভালবাসা। আবু রুশদ সাহেবের শ্বশুর আবুল হাসনাত সাহেবের মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে সৈয়দ আলী আহসান সাহেব যখন শোক জ্ঞাপনের জন্য তাঁদের তোপখানার বাড়ীতে যান, তখন আমি তাঁর সঙ্গে ছিলাম। ১৯৮২ সালে তাঁর স্ত্রী কমর মুশতারী আহসানের গল্প গ্রন্থ প্রকাশ ও জন্মদিন উপলক্ষে দেখেছি আবু রুশদের অনবদ্য অংশগ্রহণ। সেখানে বেগম সুফিয়া কামাল, সৈয়দ আবদুস সুলতান সহ বহু লেখক, আত্মীয়-স্বজনের সমাবেশ ঘটেছিল।

অনেক সময় তাঁরা দুজন একান্তে বসে নানা বিষয়ে আলোচনা করতেন। অন্য অনেক ক্ষেত্রে আমিও অংশগ্রহণ করতাম। কিন্তু রাশভারী রুশদ সাহেবের সঙ্গে আলোচনার সময়ে আমি বিশেষ প্রয়োজন ব্যতিরেকে সামনে হাজির হতাম না। আমরা দু'জন আবু রুশদের বাংলা একাডেমীতে

শওকত ওসমান ও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ সম্পর্কিত বক্তৃতার সময়ও উপস্থিত ছিলাম।

কিন্তু সবচে' বড় কথা মৃত্যুপূর্বে সৈয়দ আলী আহসান সাহেবের জ্যেষ্ঠ সন্তান সৈয়দা নাজ কমরকে লিখিত এক ইচ্ছাপত্রে তিনি প্রকাশ করেন যে, মৃত্যুর পর বইয়ের আয় থেকে তাঁর সন্তানেরা যেন একজন সাহিত্যিককে সম্মানিত করে- একটি স্মৃতি স্বর্ণপদক প্রদানের মাধ্যমে এবং প্রথম পদকটি যেন অবশ্যই আবু রুশদ মতিনউদ্দীনকে অর্পণ করা হয়। ২০০২ এর ২৫ শে জুলাই তাঁর তিরোধানের পর ২০০৮ সালের ২৫ শে মার্চ পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হয় সেই বিশেষ সন্ধ্যাটির জন্য।

সৈয়দ আলী আহসানের ৮৮ তম জন্মতিথিতে এই অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয় ঢাকাস্থ আলিয়ঁস ফ্রঁসেজে। এতে সভাপতিত্ব করেন প্রফেসর এমাজউদ্দিন আহমদ এবং প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন ফ্রান্সের মহামান্য রাষ্ট্রদূত জাক্-অঁদ্রে কস্তিয়েস। রাষ্ট্রদূত অধ্যাপক আবু রুশদের গলায় স্বর্ণপদকটি পরিয়ে দেন। তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে তিনি সম্বর্ধিত অধ্যাপককে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন এবং জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসানের সঙ্গে ফরাশি বুদ্ধিজীবীদের সুসম্পর্কের ওপর আলোকপাত করেন। তিনি আরো বলেন যে অতি সংগত কারণে ১৯৯২ সালে ফরাশি সরকার অধ্যাপক আহসানকে সাহিত্য-শিল্প সম্পর্কিত একটি অতি উচ্চ সম্মাননায় ভূষিত করেন।

প্রফেসর এমাজউদ্দিন তাঁর সভাপতির ভাষণে বলেন, আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ও জাতীয় অগ্রগতির ক্ষেত্রে সৈয়দ আলী আহসানের অবদানের কথা এই মার্চের দিনে বিশেষ ভাবে স্মরণযোগ্য। জীবনের শেষ দিনেও তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে উন্নয়নের কথা ভেবে পূর্ব -প্রবর্তিত তাঁর স্ত্রীর নামে যেমন স্মৃতি পুরস্কার দিয়ে গেছেন, তেমনি তাঁর বই বিক্রির আয় থেকে একজন শ্রেষ্ঠ লেখককে সম্মানিত করবার জন্যে তাঁর নিজের নামেও একটি স্বর্ণপদকের ব্যবস্থা করে গেছেন। বলা বাহুল্য, এক্ষেত্রে তাঁর নির্বাচন যথোপযুক্ত হয়েছে। কেননা আবু রুশদ যথার্থই আমাদের কথাসাহিত্যের এক মহীরুহ।

আলঝেইমারস্ রোগে আক্রান্ত অধ্যাপক আবু রুশদকে সেদিন অনেকখানি সুস্থ ও উৎফুল্ল দেখাচ্ছিল। তিনি সুনির্বাচিত শব্দ প্রয়োগে তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন যে, আলী আহসান একটি ভালো কাজ করেছেন। তিনি আমার যথার্থ বন্ধু ছিলেন।

অনুষ্ঠানে ইতিহাসবিদ শাহরিয়ার ইকবাল, প্রফেসর মোহাম্মদ আব্দুল কাইয়ুম, ড. রফিকুল ইসলাম, অধ্যাপক আব্দুল মান্নান (সাবেক এমপি, মেহেরপুর), চিত্রপরিচালক চাষী নজরুল, ড. নিয়াজ জামান, ড. জোসেফ টি ও ক'নেল প্রমুখ দুই অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান ও আবু রুশদ মতিনউদ্দীনের গুণাবলী তাঁদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে বর্ণনা করেন। আবু রুশদের পদক প্রাপ্তিতে অধ্যাপক আহসানের অন্তিম ইচ্ছা, অনেকের মতে, পুরস্কারটিতে এক মনিকাঞ্চণ যোগ করল।

ব্যক্তিগত কিছু অভিজ্ঞতার কথা এখন বলি।

চল্লিশের দশকে কৈশোর উত্তীর্ণ হবার আগেই *সওগাত*, *মাসিক মোহাম্মদী* পত্রিকায় আবু রুশদের প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ *রাজধানীতে ঝড়* -এর বিজ্ঞাপন পড়েই আমার মনে যেন ঝড় বয়ে যায়। রাজধানী কাকে বলে এবং কোথায় তা অবস্থিত তা বোঝার বয়সও তখন আমার হয়নি *এখন স্বনির্বাচিত গল্প গ্রন্থে* সংকলিত গল্পটি পড়ে আমার বেশ ভাল লাগল। মনে হল স্নিগ্ধ, মনোরম পরিবেশ সৃষ্টির কৌশল রুশদের প্রথমাবধি করায়ত্ত। মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত মুসলিম সমাজের স্বচ্ছন্দ পরিচয় প্রদানে তাঁর সময়ে তাঁর জুড়ি ছিল না। সেদিক থেকে তিনি শওকত ওসমান ও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর যথার্থ পূর্বসূরি। কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে *এলোমেলো*, *সামনে নোতুন দিন*, *নোঙ্গর*, *অনিশ্চিত রজনী* প্রভৃতি। ইংরেজি অনুবাদে লালনগীতির একটি নির্ভরযোগ্য সংকলন বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া রয়েছে তিন খন্ডে আত্মজীবনীর একটি সেট যা সর্বার্থে অসাধারণ।

অক্সফোর্ডের ডিগ্রীধারী ইংরেজির অধ্যাপক আবু রুশদকে আমি প্রথম দেখি ১৯৫৮ সালের শেষ দিকে ফজলুল হক মুসলিম হলের মিলনায়তনে। পূর্ববঙ্গের সাহিত্য বিষয়ে খান সরওয়ার মুর্শিদ প্রযোজিত এক সেমিনারে তিনি প্রবন্ধ পাঠ করেন। আমাদের সমালোচনা সাহিত্যের ওপর ইংরেজিতে লেখা ছিল প্রবন্ধটি। তাঁর আলোচনায় তিনি অনেক সমালোচককে তীব্র কশাঘাতে ধরাশায়ী করেছিলেন বলে মনে পড়ে- সেই অল্প বয়সে অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে ব্যাপারটি আমি উপভোগ করেছিলাম। অবশ্য সেটিও খুব উচ্চাঙ্গের আলোচনা ছিল বলে আমার ধারণা।

এরপর ১৯৬৫ সালে ডক্টরেট ডিগ্রী নিয়ে দেশে ফিরে চট্টগ্রাম কলেজে বাংলার প্রধান অধ্যাপক আলাউদ্দিন আল আজাদ সমভিব্যহারে আমি অধ্যক্ষ আবু রুশদের সৌজন্য সাক্ষাত লাভে ধন্য হয়েছিলাম। তিনি ইউরোপীয় সাহিত্য সম্পর্কে আমাকে বহু প্রশ্ন করেছিলেন, মনে পড়ে।

১৯৭১ সালে তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয় নি। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের শুভযোগবিশেষে মোল্লা জালালুদ্দিন আহমদ ও আমি যখন বৈরুত-এ আরবদের আমাদের সপক্ষে আনবার প্রয়াস পাচ্ছিলাম তখন আর্ন্তজাতিক মিডিয়াতে প্রকাশিত হলো একটা বড় সংবাদ। সেটি হলো ওয়াশিংটনে পাকিস্তান দূতাবাসের বেশ ক'জন কর্মকর্তার বাংলাদেশের পক্ষে যোগদান। এঁদের মধ্যে ছিলেন এডুকেশন কাউন্সিলার অধ্যাপক আবু রুশদ। এই দু:সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করে শালপ্রাংশু রাজসিক মানসিকতার মানুষটি যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের প্রচার কার্যে বিপুল অবদান রেখেছেন।

১৯৭৩ সালে লন্ডনে বন্ধু ওবায়েদ জায়গীরদার-এর সুবাদে সত্যজিৎ রায়ের নবনির্মিত ছবি *অশনি সংকেত* দেখবার একটি প্রবেশপত্র পাই। সেখানে আচমকা সাক্ষাৎ ঘটে আবু রুশদ সাহেবের সঙ্গে। ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি পারিবারিক কুশল সংবাদ সহ দেশের খবর জেনে নিতে ভোলেননি।

এর পরের উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটলো ১৯৯০ সালের জানুয়ারি মাসে। এই ঘটনা আবু রুশদের চরিত্রের যথার্থ স্বরূপ উদঘাটন করবে। সবে বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালকের পদে আমি যোগ দিয়েছি। অমর একুশের বইমেলা, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রোগ্রাম নির্মাণে মহাব্যস্ত। সহকর্মীরা জানান, আমি বললে কবি শামসুর রাহমান অংশগ্রহনে রাজি হবেন। কিন্তু ফোনে তিনি 'না' 'না' করলেন। বিস্মিত হলেও আমি দ্রুত জানলাম যে, ইতোমধ্যে তাঁর সম্পাদিত *মূলধারা* নামে যে নতুন সাময়িকী প্রকাশিত হচ্ছে তাতে তিনি আমার নিয়োগের বিরুদ্ধে সম্পাদকীয় লিখেছেন। শিরোনাম 'অপ্রত্যাশিত কিছু নয়...'। আসলে এটি ছিল অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসানের বিরুদ্ধে ভয়ানক রকমের বিষোদ্‌গার! কারণ তিনি নাকি সারা জীবন এই ধরণের স্বজনতোষণ করেছেন। অর্থাৎ তিনি রাষ্ট্রপতিকে বলে আমার নিয়োগটি সম্পাদন করিয়েছেন। মহাক্ষুব্ধ আহসান সাহেব বিচারপতি আব্দুর রহমানের পরামর্শক্রমে একটি উকিল নোটিশ প্রেরণ করেন। কবি শামসুর রাহমান, যদ্দুর জানি, ক্ষমা প্রার্থনা করে অব্যাহতি পেয়েছিলেন। অবশ্য এর লিখিত কোন প্রমাণাদি আমি পাইনি। তবে জানি, এরপরেও তিনি শিল্পী আবুল কাসেমকে নিয়ে সৈয়দ সাহেবের বাসায় এসেছিলেন। অন্যদিকে অগ্রজপ্রতিমের উপর্যুক্ত ব্যবহারে আমারও যথেষ্ট মন খারাপ হয়েছিল। কেননা ১৯৫৪ সাল থেকে তাঁর সঙ্গে আমার ছিল সুসম্পর্ক। কিন্তু তখন অর্থাৎ সেই নব্বই সালে আমি সার্কাসের চরিত্রের মত আগুনও হজম করে নেবার জন্য নিজেকে তৈরি করছিলাম। সৌভাগ্যের বিষয়, দু'চার দিনের মধ্যে *নিউনেশন* পত্রিকায় আবু রুশদ তাঁর

নির্ধারিত কলামে বিষয়টির ওপর আলোকপাত করলেন। তিনি বেশ কড়া ভাষায় শামসুর রাহমানকে তিরস্কার করলেন। আবু রুশদের অত্যন্ত স্নেহভাজন হওয়া সত্ত্বেও তাঁর নির্মম সত্যবাদী কলম কবিবরকে অব্যাহতি দেয়নি সেদিন। আবু রুশদ আমার উপযুক্ততার স্বপক্ষেও কিছু মন্তব্য করেছিলেন বলে, মনে পড়ে। কিছু আসল ঘটনা আজ বিশ বছর পর এখনও অঘটনঘটনপটিয়সীরা জীবিত থাকতে জানিয়ে দেওয়া ভালো।

বাংলা একাডেমীতে আমার সহপাঠি-বন্ধু আবু হেনা মোস্তফা কামালের জীবিতাবস্থায় তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলছিলো। মহাপরিচালকের আসনে বসানোর জন্য যাঁদের কথা ভাবা হচ্ছিল আমার নামও তাঁদের মধ্যে ছিল। রাজশাহীতে কর্মরত অবস্থায় আমি জানলাম আবু হেনার মৃতদেহকে সামনে রেখে বুদ্ধিজীবীদের কেউ কেউ মন্তব্য করেছিলেন, 'এবার কোরেশীকে আর ঠেকানো গেল না।' এর দু'চার দিন পর আমি ঢাকায় এসে আবু হেনার পরিবারবর্গের সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে অধ্যাপক আহমদ শরীফের বাসায় গেলাম। কথাবার্তার শুরুতেই আমার শিক্ষক বললেন :

'কী, তুমি তো বাংলা একাডেমীতে আসছো শুনলাম।'

'স্যার, আমি তো শুনিনি, কেউ তো আমাকে বলেনি।'

'বলবে বলবে। যথা সময়ে বলবে।'

'আর যদি সত্যি সত্যি বলা হয়, আমি কি আসবো স্যার, আসা কি ঠিক হবে আমার?'

'কেন আসবে না? তুমি তোমার কৃতিত্বে অধিষ্ঠিত হবে' ইত্যাদি এরকম কিছু কথা তিনি বলে গেলেন। আমি ইচ্ছা করে আর এগোলাম না। প্রসঙ্গ পরিবর্তনে সচেষ্ট হলাম। অন্যদিকে নিয়োগ প্রাপ্তির কয়েকদিন আগে অধ্যাপক আহসান আমাকে বলে রেখেছেন, 'তুমি বাংলা একাডেমীতে আসবেনা কিন্তু।' এবং তিনি অধ্যাপক আব্দুল কাইয়ুমকে ডেকে পাঠালেন মন্ত্রণালয়ে নিজের সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জী পৌঁছিয়ে দিতে। কিন্তু ঘটনার মোড় ঘুরে গেল জাতীয় যাদুঘরের মহাপরিচালক ড. এনামুল হক সংস্কৃতি সচিবের দায়িত্ব পেয়ে যাওয়ায়। তিনি বহুদিন ধরে আমাকে বলে আসছেন, 'কী, ঢাকা চলে আসেন না কেন?' আমার নির্বিরোধী জবাব, 'কে আমাকে ঢাকায় আনে?' এবার ড. হক তাৎক্ষণিকভাবে মন্ত্রী সৈয়দ দীদার বখত সাহেবকে রাজী করিয়ে রাষ্ট্রপতি এরশাদের অনুমোদন আদায় করলেন। কিন্তু রাষ্ট্রপতি নাকি একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন, 'ওনাকে (অর্থাৎ আমাকে) আনলে স্যারের অসুবিধা হবে নাতো?' সরকারী কার্যালয়ে তখন 'স্যার' বলতে কাকে বোঝায় তা অজানা ছিল না কারো। সত্যি সত্যি তাঁরই অসুবিধা হলো

বেশি। অন্যদিকে এটা স্পষ্ট করে বলা দরকার যে আমার নিয়োগের কৃতিত্ব বা দায়দায়িত্ব ছিলো সম্পূর্ণত ড. এনামুল হকের। আমার পক্ষ থেকে কোন কার্যকর উমেদারি করা হয়নি।

তবে এই নিয়োগের ফলে আমি যেমন কিছু বন্ধু হারালাম, তেমনি নতুন মিত্র পেলাম অনেক। দেশ-বিদেশের বহু গুণীজন আমার একবছর একমাস কর্মকালে আমাকে অভিনন্দিত করেছেন, সহযোগিতা দিয়েছেন। এবং বহু বছর পর কবি শামসুর রাহমান আমাকে একটা টেলিফোন করে 'আড়ি' ভেঙ্গে 'ভাব' নিতে বাধ্য করলেন। সে মুহূর্তে তাঁর সামনে ছিলেন যিনি তিনি হলেন অধ্যাপক মুহম্মদ আব্দুল হাই (বিদ্যাসাগর)। *প্রথম আলো* পত্রিকায় ড. লোকনাথ ভট্টাচার্য সম্পর্কে প্রকাশিত আমার একটা প্রবন্ধের সূত্র ধরে শামসুর রাহমান-ভাই কথাবার্তা শুরু করলেন অর্থাৎ আমার 'মান' ভাঙালেন। আমি অভিভূত হয়ে গেলাম। তবে তাঁর সাথে জীবিতাবস্থায় আর আমার সাক্ষাৎ হয়নি। আমি তাঁর জানাজায় শরীক হয়েছিলাম যা হতে পারিনি আবু রুশদের ক্ষেত্রে। কেননা মৃত্যু সংবাদটি আমি পাইনি। কুলখানিতে উপস্থিত হবার সুযোগ অবশ্য পেয়েছিলাম। অধ্যাপক মুনসুর উদ্দীনের অনুসরণে বলি, 'আল্লাহ মেহেরবান!'

ডিসেম্বর ২৯, ২০১০

WILLIAM MEREDITH AND HIS BENGALI DOUBLE

Almost unknown in Bangladesh, a distinguished American poet is now being introduced to innumerable indigenous poetry lovers.[1] He is William Meredith, a marked modern American personality in poetry with distinct cosmopolitan attitudes. It is good to say at the outset that this poet would soon get host of admirers and imitators here for his subtle and sober presentation of themes and forms which, to say the least, are attractive and penetrating.[2] Daniel Hoffman in his *Harvard Guide to Contemporary American Writing* (1981 : 477) justly comments, "without raising his voice, in a. modest style modelled on speech rythms, Meredith embodies in his work the artist's quest for order in a shattered world."

The image of this shattered world prefigured, however, in the writings of early modernist masters in American poetry. Consider, for example, T. S. Eliot's *The Waste Land* (1922), Wallace Stevens Harmonium (1923), Williams Carlos William's *Spring and All* (1923), and Ezra Pound's *A Draft of XVI Cantos* (1925). These and other works of the above mentioned masters influenced tremendously not only the American poets of later generations but also of other parts of the world.

Meredith was in his infancy when these books were published. Born in New York in 1919, his first book of poems, *Love Letter from an Impossible Land* was published in 1944, crowned by its inclusion in Yale series, thanks to the initiative of the famed critic Archibold Mcleash.

sorrow, affluence in pleasure, illusions in dreams, ego in determination and boundless power in forbearance. Human life is composed of these elements. And a poet, after accepting all these, presents his interpretation of life. I have found this very interpretation in the poetry of Meredith."

II

On reading Meredith, my personal impression is that, he wants to fly or float when he is on earth (or while he is just `earth walking', to use his terminology) and he dies to be down and remain on ground when he is flying up above or moving amidst the boundless sea (or 'the blue meadow' to use his favourite phrase). This is quite natural owing to the complexity of the nature of both animate and inanimate objects, and the poet likes us to share his experiences. Here, Meredith seems to me to be in tune with Saint-Exupery, the great pilot-writer of France. Saint-Exupery wrote few successful novels and travelogues, as well as an admirable fantasy for children entitled *The Little Prince* but never indulged in versification. William Meredith, on the other hand, experimented with words to *create* a poetic universe based on his personal experience as pilot, navigator or a private citizen of the United States, Operating at lower keys, treating more restricted ranges of feeling, lie 'helped to temper the prevailing romanticism with the virtues of discipline, restraint and poise' in contemporary American poetry.

Meredith is also a poet of 'identity' - identity in a very special sense. He does not like to see or feel things without having a real sensation of it or without knowing it properly. He wants to have a name of the objects already observed. This is not always an easy task due to violent disjunctions in the life of modern man. In a short poem, "Envoi" (a French word meaning 'sending', 'slipping', 'dispatch' etc.), Meredith asks a pertinent question :

Incidentally, his Bengali translator, Syed Ali Ahsan, an equally eminent poet, was born in 1920, that is to say, only a year after Meredith. And in 1944, he was completing his university education and a long poem on an ancient theme, *Chahar Dorbesh* which he discarded later on. His first book of modern verses, *Onek Akash* (Many Skies) did not come out before 1959. Meredith's *Earth Walk : New and Selected Poems* was published in 1974 (1976) and Syed Ali Ahsan's collected poems came out in 1974. Both the poet axed the translator have distinguished careers as men. of letters. Meredith is fortunate to have a translator like Syed Ali Ahsan who Is also. a noted critic and connoisseur of fine arts. Besides, he is also translator of Iqbal's poems (1952), Yvan Gall's love poems (1958), Whitman's poems (1965) and other old Hindi and modern German poetical works. After a long gap, suddenly last summer, he became involved in the translation of Meredith (which is indeed a good work, and I had the privilege of watching the work in progress). In a short eleven page introduction on American poetry, Meredith and the translation itself, he writes: "I have found pleasure in this work of translation and here is the significance of my work. I had to present the experience of life of a poet in a different language and in completely different *milieu.* This is very difficult work ..." It is interesting to note that he also mentions of being forced to use some 'interpretative phrases' evidently for general comprehension without much distortion

In another significant paragraph, Professor Ahsan indicates why he felt attracted to Meredith's poems : "I think he has tried to realize the taste of life and death to a fuller extent." Then with a philosophical overtone, he adds : "Although the birth of man is accidental, the death is certain. Within this cycle of life and death, we are ceaselessly shaked, motioned and rotated by different experiences. In this world, there are shortcomings of

যদি কেউ প্রশ্ন করে আজকের দুঃসময়ে
কেন আমি নতুন কবিতা লিখি।
এখন উত্তরে একথাই বলবো, জাহাজ
এবং অন্য আকৃতিগুলোকে বিবেচনা
করতে আমার ইচ্ছে হয়না যে পর্যন্ত না
তাদের কোনও রকম নামকরণ করতে পারি,
অস্থির হয়ে কি ভাবেই বা তাদের নামকরণ করবো?

This is the first poem selected from his book, *Ships and other Figures* (1948/1982 : 45). The poet concludes "Transport" (1982 : 48), another poem of the same book with a convictions an optimism :

কিন্তু আমাদের বিশ্বাস আছে
আমরা সমুদ্র পার হবই।

In "Sunrise with Crows" from his *The Open Sea and Other Poems* (1958 / 1982 : 61), he declares categorically :

যারা আশাবাদী তাদের আমি ভালোবাসি
তারা কখনও অশুভ লক্ষণকে মেনে নেয় না
কাক ডাকলেও সুর্যোদয় তাদের কাছে স্বর্ণোজ্জ্বল
কত দুর্গ এবং স্মৃতিস্তম্ভ চীনের এবং গ্রীসের
মানুষের চেয়েও ছোট ছোট হয়ে ভেঙ্গে ছড়িয়ে আছে

Meredith's fourth book, *The Wreck of the Thresher* (1964) contains poem which deal with these two favorite themes of the poet – 'identity' and 'optimism'. In the title-poem (1982-80) he reminds us, for example :

মানুষের অনবরত ধ্বংস নিয়েই আমরা বেঁচে থাকি
প্রত্যহ, কোন অসতর্কতায় অথবা মৃত্যুর দুরভিসন্ধিতে
গাড়ীর চাকায় পিষ্ট হয়ে, আকাশ থেকে পড়ে, আগুনে পুড়ে
পুরুষ মেয়েরা বিশ্বাসের অঙ্গীকার ভেঙ্গে ফেলে :
এবং এখন পানির তলায় শেওলার মতো হারিয়ে গেলে
সমুদ্রের প্রচন্ড চাপ তাদের সহ্য হলনা, আর কিছু মানুষ
এখনও নির্ভয়ে ভাঙ্গা গলুয়ে জড়ো হয়েছে

and yet

একটি পোতাশ্রয়ের
দিকে তাকিয়ে দেখুন : মানুষের চেয়েও সুদৃশ্য সুঠাম
ভঙ্গীতে তারা তাদের কর্মের দায়িত্বে
আসা যাওয়া করে
সবুজ মাঠের মতো সমুদ্রের ক্ষেতে খামারে তারা
কাজে নামে,
রমণীর মতো তারা রমণীয়, অনেকের নামকরণ আবার
সম্ভ্রান্ত মহিলা এবং রাণীদের নামে হয়।

His optimism is almost epidemic. Consider, for example, the concluding lines from "On Falling Asleep ro Birdsong" (1982 : 84).

পাখীকে বলি আমি আমরা বাঁচবই
জীবন একটিই হোকনা তাতে কি?
বাঁশীর সুর নিয়ে সময় জেগে উঠে
এখন অথবা রাতের দেহলীতে –
জ্ঞানের বিশ্বাসে অথবা বেদনায়।
যদিবা সহসাই অন্ধ ডাক আসে
অর্থ যাই হোক সহ্য কোরবই –
মধ্য রাত্রিতে তন্দ্রা ভেঙ্গে যায় –
পাখীর ডাক শুনে একাকী শয্যায়।
বয়স বাড়বেই সময় বদলাব;
গল্প কাহিনীর যেমন কথা হোক
অর্থ খুঁজেছি – বাঁচবো নিশ্চয়ই
সব সামগ্রী একক সম্ভারে
জীবন শোভমান, সত্য সত্যই।

III

Meredith's cosmopolitanism is synonymous to his humanism at large. This is not in contrast to his pronounced localism. as expressed in "Fledglings", "Walter Jenk's

Bath", "Hydraulics", "Whorls", "A View of the Brooklyn Bridge", "Roots", and a few other poems. His foreign affiliations are identified chiefly with Greek, Irish and French references. Besides, Babel of the Bible, Asian culture-spots like China, Japan and Korea have their places in his poetic map. Abrupt mention of arts and artists appears in Meredith's poems. In this way, we find that Velasques, Poussin or Persian miniatures have been cited here and there. One doubts, however, the significance of their presence although one cannot totally deny the importance of such references as they might reveal certain experiences of the poet. Like most modern poets anywhere in the world, Meredith shows partiality for France in matters of references cited. Besides two poems, "Notre Dame de Chartres" (1982 : 48-54) and "Letter from Mexico" (1982 : 73-74) were written as if to pay homage to France, particularly to "the expressed desire of the heart" (চিত্তের যে আকাংক্ষা প্রকাশ পেল ... পৃঃ ৫৮). His poem "For Guillaume Apollinaire" (1982 : 94) does not leave, however, an impressive evocation of the early French master of modern aestheticism. On the other hand, he could identify well the real suffering of "A Korean Woman Seated by a Wall". (*The Open Sea,* etc./1982 : 75-76) with true feelings of a poet :

এশিয়ার সীমাহীন দুর্ঘটনাকে অতিক্রম করে
তিনি নিজেকে প্রকাশ করেন যন্ত্রণার একটি
মানদন্ড নির্ণয় করে

Many other interesting aspects of Meredith's poetry and his poetical personality could thus be identified and analysed. But I am afraid that my readers would then be too exhausted to forgive me. I would, therefore, conclude by saying that it has been a rewarding experience for me to start reading William Meredith even through Bangla translation. I have been instantly infused with an aesthetic

pleasure "impelled by a moral purpose". The need for "accountable eyes" to design the "tapestry" from the chaos of a world at war has been happily insisted and finally we can expect:

মানব – রক্তের ঐশ্বর্যে পৃথিবীর সকল জাতিই
তোমার বন্ধু হবে :
ইতিমধ্যে অপরাধের বিরুদ্ধে নিরলস সংগ্রাম কর –
দীর্ঘ সংগ্রাম – হয়তো বিরাটের বিরুদ্ধে ক্ষুদ্রের সংগ্রাম
মনে রাখতে হয়, এভাবেই এগুতে হয় – এক দ্বীপ থেকে
অন্য দ্বীপে।[3]

NOTES

1. Fortunately, I started my paper with the word 'almost', for, after completing the article I have just discovered that there is a short write - up on Meredith by Al-Mujahidi published with a photograph and a few lines in translation in the weekly **Rob-bar** (Sunday), vol. III/11; November 9, 1980 : 46-47). Meredith even made a trip to Bangladesh in Sept. 1980 and met local poets. This occasion serves as the central theme of Al-Mujahidi.
2. *William Meredither Nirbachito Kobita,* Dhaka, Khoshroj Kitab Mohol, Dhaka
3. "Do Not Embrace Your Mind's New Negro Friend" : "সংগ্রাম" (১৯৮২ : ৮০)

Léopold Sédar SENGHOR
B.P. 5106
DAKAR-FANN (Sénégal)

N° 1715/K2
Verson, le 27 Août 1984

Monsieur le Professeur,

J'ai bien reçu votre lettre du 23 mai 1984. Si je ne vous ai pas répondu plus tôt, c'est que j'ai beaucoup voyagé depuis lors.

Ce que vous m'avez dit du Grand Poète du Bangladesh Syed Ali Ahsan m'a beaucoup touché, d'autant que j'avais entendu faire son éloge.

Comme je suis moi-même poète, je ne saurais mieux faire que de vous envoyer, en son honneur, un poème de moi, qui est inédit. Il vous sera facile de le faire traduire en anglais.

Veuillez croire, Monsieur le Professeur, à l'assurance de ma très haute et cordiale considération.

Léopold Sédar SENGHOR

Monsieur le Professeur Mahmud Shah Qureshi
Institute of Bangladesh Studies
University of Rajshahi
Rajshahi
BANGLADESH

English translation from the
Original French.

B.P. 5106
DAKAR-FANN (Senegal)
N0.1715/k2
Version. 27th August. 1984

Mr. Professor
I received your letter of 23rd May 1984. If I had not replied you earlier that was because I was traveling a lot since then.

I was much touched by what I learnt from you about the great poet Syed Ali Ahsan. more because I knew him and had heard praises about him.

As I am a poet myself. I cannot do better than sending in his honour, a poem of mine which is unpublished. It will be easy for you to translate it in English.

Please trust. Mr. Professor to the assurance of my very high and cordial consideration.

Leopold Sedar Senghor.

Mr. Professor Mahmud Shah Qureshi
Institute of Bangladesh Studies
University of Rajshahi. Rajshahi
Bangladesh

TU ES VENUE

Tu es venue.
Tes yeux ont traversé mes yeux
Tes yeux aimantés par le foyer tiède
Où se lève fatal le noir cracheur serpent.
Nos mains se sont effleurées, oh, à peine
Nos bras ne se sont point étreints
Ni les lianes musclées de nos jambes
Ni nos âmes unies dans le souffle odorant
De l'Harmattan. Je comprends maintenant
Que les jeunes gens si soudain se tuent
D'un seul coup sec, qui n'ont pas leur navette rouge
Pour tisser les chansons qui refont mélodieux
Le Paradis perdu.

সৈয়দ আলী আহসানকে

তুমি এলে

লেওপোল্‌দ সঙঘর

তুমি এলে
তোমার চোখ আমার চোখের সামনে
দিয়ে চলে গেল
তোমার চোখ ঈষদুষ্ণ বাড়ির স্পর্শে
চুম্বকের স্বাদ পেল
যেখানে ভয়ঙ্কর কালো সাপ ফণা তুলে
দাঁড়িয়ে থাকে
আমাদের হাত পুষ্পিত কিন্তু আমাদের বাহু
একে অন্যকে আলিঙ্গন করতে পারছে না
আমাদের পায়ের লতানো মাংসপেশী
অথবা আমাদের আত্মা একটি একক ভাস্কর্যে
গড়ে উঠতে পারছে না। এখন আমি
অনুভব করি
কী করে তরুণ বয়সীরা অকস্মাৎ নিহত হয়
একটিমাত্র অসতর্ক আক্রমণে
তারা তখনো সময় পায়নি
হারানো স্বর্গকে
নতুন সঙ্গীতে মুখর করে তুলতে।

মূল ফরাশি থেকে অনুবাদ :
মাহমুদ শাহ কোরেশী

সৈয়দ আলী আহসান সংবর্ধনা গ্রন্থ (১৯৮৫) থেকে পনর্মুদ্রিত

YOU CAME

You came
Your eyes passed across my eyes
Your eyes magnetized by the lukewarm home
Where rises fatal the black spitting serpent
Our hands are flowered themselves, oh, just
Our arms could hardly embrace themselves
Neither the muscled liana of our legs
Nor our souls could unite in the fragrant breath
of the Harmattan. I realize now
How the youngones so suddenly get killed
By a single dry blow. who have not got their red shuttle
To weave the songs that recast melodious
The Lost Paradise.

Translated from the French Original by
Mahmud Shah Qureshi

Reprinted from the *Souvenir* published on the occasion of launching FESTSCHRIFT FOR SYED ALI AHSAN (1985)